একুশে ফেব্রুয়ারি 'মহান শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবস ২০১০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে

স্ম র ণি কা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

০৯ ফাল্গুন ১৪১৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে ফেব্রুয়ারি 'মহান শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের
শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে

স্মরণিকা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০
০৯ ফাল্গুন ১৪১৬

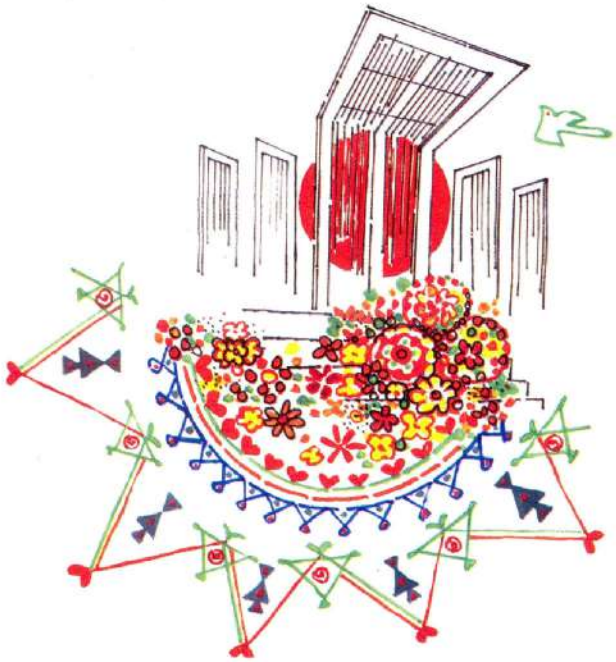

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০
০৯ ফাল্গুন ১৪১৬

প্রকাশনায়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচ্ছদ
সমরজিৎ রায়চৌধুরী

পোস্টার মুদ্রণ ক্রোড়পত্র ও স্মারণিকা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক
জনাব এস এম আশরাফুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্য সচিব
জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্য
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, উপ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব আবুল কাশেম, পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আনসার আলী, উপ প্রধান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, উপ সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডিএফপি-এর একজন প্রতিনিধি
পিআইডি-এর একজন প্রতিনিধি
ডক্টর জীনাত ইমতিয়াজ আলী, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর সৌরভ সিকদার, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫
ফোন : ৮৬১৭১৫৮, ৮৬১১৪৩৩ ই-মেইল: bersha_123@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৯ ফাল্গুন ১৪১৬
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি 'মহান শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবস। আমি এ দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদ জব্বার, বরকত, রফিক, সালামসহ নাম না জানা শহীদদের। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এ দিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধনকে আমি স্বাগত জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং স্বাধিকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। এ আন্দোলন তাই কেবলই আমাদের মাতৃভাষার দাবি আদায় করেনি; বরং এরই পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মওলানা আকরম খাঁ, বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী গোলাম মাহবুব, ভাষাসৈনিক গাজীউল হক সহ সকল ভাষাসৈনিককে; যাঁদের অসীম সাহস ও অদম্য প্রেরণায় ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। সকল অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমাদের উজ্জীবিত করে এই সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির লালনসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত প্রেরণা যোগায়।

আমরা আজ গর্ববোধ করি এই ভেবে যে শহীদ দিবস তথা ভাষা দিবসের ধারাবাহিকতায় ২১ ফেব্রুয়ারি পরিণত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের যে গভীর তাৎপর্য তার অনুরণন আজ আমরা সারা বিশ্বে দেখতে পাই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। অমর একুশে কেবল আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অগ্রযাত্রাকে অনুপ্রাণিত করছে না; বরং তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন ও সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাচ্ছে। মহান ভাষা দিবস আজ পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, বিশ্ববাসীকে করেছে ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

আমি আশা করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পৃথিবীর নানা জাতি-গোষ্ঠীর ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। আমি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

দয়াময়ী
যাদুনাথ
আমরা বাঙালী বাস করি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৬
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বাণী

ভাষা শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত মহান শহীদ দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ভাষা শহীদদের পাশাপাশি সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

৫২'র ভাষা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত অর্জন এখন আর শুধু বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকজন প্রবাসী তরুণের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে মহান একুশে আজ সারা বিশ্ববাসীর।

এ স্বীকৃতিকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ২০০১ সালের মার্চে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই। কিন্তু বিগত জোট সরকারের সময় এ প্রতিষ্ঠানটির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমরা গত বছর দায়িত্ব নেওয়ার পর আবারও এ ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু করি এবং আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে যাচ্ছে।

আমার বিশ্বাস, ভাষা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এ প্রতিষ্ঠানটি ৫২'র ভাষা আন্দোলনের একটি অন্যতম স্মারক হিসেবে পরিগণিত হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট শুধু ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ নিয়েই কাজ করবে না; এটি ভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সেতু বন্ধনের কাজ করবে।

আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৬
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বাণী

ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর মহান ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামদীপ্ত একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবের এক অন্যতম মাইলফলক। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির মাতৃভাষা রক্ষায় সাহসী আত্মদানকে আমরা জাতীয় পরিসরে পরম শ্রদ্ধা, শোক ও গর্বের সাথে স্মরণ করে আসছি। এ ঘোষণার মাধ্যমে মাতৃভাষাকে রক্ষা, লালন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের গভীরতম মানবিক চেতনাকে ধারণ করে জাতিসংঘ সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করার স্বীকৃতি দিয়েছে।

২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার উদ্যোগ সফল করার জন্য তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বাত্মক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে দেশ, জাতি ও জনগণের সুদূরপ্রসারী স্বার্থে সরকারি প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এস এইচ কে সাদেক সাহেবের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে সম্মেলনের বিষয়টি তদারকি, তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ বাংলা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত প্রতিনিধিদল ও ইউনেস্কো সদর দপ্তরে তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী তাঁদের স্ব-স্ব মেধা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাকে শতভাগ প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা প্রচেষ্টায় কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ গোষ্ঠীর রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামসহ সাত জাতি সাত ভাষার ১০ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে এ গর্বিত ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। এজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

সমগ্র পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ও বিকাশমান সকল মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকারের চেতনা সকল রাষ্ট্রে সমুন্নত হচ্ছে। আর এ বিশাল অনুপ্রেরণার মূল উৎস ধারা বাঙালির শহীদ দিবস। বাংলাদেশের ভাষার আন্দোলন আজ সারা পৃথিবীর ভাষার অধিকারে রূপ লাভ করেছে। এটি বাংলাদেশের আপামর জনগণের অতি গর্বের বিষয়।

মাতৃভাষা বাংলাকে সমুন্নত রাখা ও সমৃদ্ধায়ন, বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির মাতৃভাষা চর্চা, গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধণের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টনের উৎসব-সমাবেশে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন। তিনি ২০০১ সালের ১৫ মার্চ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্বের সকল জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সে প্রতিষ্ঠানটির আজ উদ্বোধন হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলা ভাষাসহ সারা বিশ্বের সকল মাতৃভাষা চর্চা, উন্নয়ন ও গবেষণার মূল কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হোক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হোক বিশ্বের সকল মানুষের আশা-আকাঙ্খা, অভিব্যক্তি ও চেতনা বিকাশের অনুপ্রেরণাস্থল– এ আমার প্রত্যাশা।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি

সৈয়দ আতাউর রহমান
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৬
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনগুলির একটি।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে ঘোষণা করে। এই দিবসের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর ভাষাবৈচিত্র সংরক্ষণ, বহু ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়া এবং সমঝোতা, সহনশীলতা ও সংলাপের ভিত্তিতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূর্ণ বিকাশ সাধন। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি একদিকে সমগ্র বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে; অন্যদিকে বাংলাদেশের ওপর অর্পিত হয়েছে এক সুমহান দায়িত্ব।

২০০১ সালের ১৫ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১১তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উন্মোচিত হচ্ছে আরেক মাইল ফলক। বিশ্বের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং গবেষণার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সারাবিশ্বের মানুষের ভাষা গবেষণা এবং সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে এ ইনস্টিটিউট একদিন বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই মহান দিবসে অমর ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক। এ কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সৈয়দ আতাউর রহমান

মা মাতৃভূমি মাতৃভাষা

আহমদ রফিক

জন্মেই আমি মাকে চিনি। কথা বলতে শিখে যে ভাষায় মাকে ডাকি, সে ভাষার সাথে সম্পর্ক নিবিড় হয় মাকে চেনার মাধুর্যে, মা বলে ডাকার মধুর আবেগে। সেই আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে ভাষা আমরা চিনি মায়ের মুখের ভাষা হিসেবে; স্বভাবতই মাতৃভাষা হিসেবে এর পরিচয় চিহ্নিত হয়ে ওঠে।

মাকে ডাকার এবং মায়ের মুখের ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা তাই আমাদের অস্তিত্বে জড়ানো, আমাদের রক্তে মেশানো। এই ভাষার সাথে বিচ্ছিন্নতার অর্থে ছিন্নমূল হওয়া। মায়ের সাথে সমীকরণে যেমন ভাষার মাতৃভাষায় উত্তরণ, তেমনি মায়ের সাথে আরো একটি সমীকরণে উঠে আসে দেশ তথা মাতৃভূমি।

বড় হয়ে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে চারিদিকে চাইতেই চেনা হয়ে যায় মাটি নিসর্গ আর মানুষ। অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে। মাটির উষ্ণ মমতায়, নিসর্গের অবাক সৌন্দর্যে আর চলমান মানুষের জীবন-যাপনে একাকার হয়ে গড়ে ওঠে মাতৃভূমির প্রতীকে স্বদেশ, যার উপর নির্ভর করে আমাদের অস্তিত্ব, জীবন যাপনের বৈচিত্র্য এবং আপন বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত স্বাধীন সজীব সত্তা।

মা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা—এই তিনের সম্পর্ক তাই এক জাদুকরী ত্রিভূজের অস্তিত্বে বাঁধা। এই বাঁধুনির শক্তিরূপে যে অমোঘ আবেগের উৎসার, তা যেমন মায়ের প্রতি ভালোবাসায় পরিস্ফুট, তেমনি পরিস্ফুট সমষ্টির অস্তিত্ব-নির্ভর স্বদেশের প্রতি প্রেমে এবং একই কারণে, একই নিয়ম মেনে ভাষার প্রতি সুগভীর মমতায়।

হয়তো তাই কবি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন "মায়ের বুকের মত পেতে রাখা এই দেশ" এবং "মায়ের মুখের কথা, প্রেয়সীর মুখের কবিতা" (আহসান হাবীব) নিয়ে। কথা সাহিত্যিক গল্পে উপন্যাসে একই চেতনা সাজিয়ে তোলেন অথবা নাট্যকার একই চেতনার গভীর প্রকাশ বিন্যস্ত করে তোলেন, আর আমরাও সমান্তরালভাবে অনুরূপ আবেগে নিষিক্ত হয়ে উঠি। কবি সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকারই শুধু নন, প্রতিটি মানুষ যখন নিজকে ব্যক্ত করেন তখন সেই প্রকাশের মাধ্যম ভাষার সাথেও একাত্মতার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিংবা বিত্তবান-বিত্তহীনদের পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায় না। ভাষার এই সর্বজনীন চরিত্র দেশ বা জাতিগত প্রভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকের জন্য সত্য। সাথে অন্য ভাষার প্রভেদ দেশ ও জাতিগত পটভূমিতে সত্য। তখন একের স্বার্থ অন্য থেকে ভিন্ন হতে পারে। এখানেই ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং এখানেই সে বৈশিক জাতীয়তাবোধে আশ্রিত এবং বিশ্বজনীনতা থেকে খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট পরিধিতে ভাষার প্রশ্নটি বিশেষ ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময়। আবার ব্যাবহারিক দিক থেকে শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্নে ভাষার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য।

এই সব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েই সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা তাৎপর্যময়। ভূখণ্ডে ভাষা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃতি ও ভাষা একারণে-ই এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। এই বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব রাজনীতির বিচিত্র ও বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব সত্ত্বেও। ভাষা সেখানে স্বশক্তিতে বলীয়ান। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে রাজনীতি কখনো ভাষাকে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভাষার হাতেই রাজনীতি প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা সাধারণত সুস্থ পথেই ঘটে থাকে। এক দিক থেকে ভাষা সত্যিই রাজনীতি থেকে শক্তিমান; এমন কি কখনো কখনো, সংস্কৃতির পরাক্রান্ত উপাদান হিসেবে চিহ্নিত ধর্মের তথা ধর্ম-সংস্কৃতির চেয়েও।

ইউরোপের ধর্মভাষা ল্যাটিনকে তাই তার একাধিপত্য ছেড়ে দিতে হয়েছে দেশ ও জাতিগত স্থানিক ভাষার পক্ষে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বেশ চমৎকার বক্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে :

> "মধ্যযুগে য়ুরোপের সংস্কৃতির একভাষা ছিল ল্যাটিন।
> সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন
> ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলো
> সেইদিন য়ুরোপের বড় দিন। আমাদের দেশেও সেই
> বড় দিনের অপেক্ষা করবো সব ভাষা একাকার
> করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

আজ যে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি ভাষাকে ভিত্তি করে স্থানিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধরূপ শুধু স্বদেশবাসীরই গর্বের কারণ নয়, বিশ্বের তাবৎ মানুষের প্রশংসার পাত্র, তা সম্ভব হয়েছে ভাষার স্থানিক শক্তিতে দেশ ও জাতির উৎসারিত আবেগের পথে। স্বাতন্ত্র্য যে সর্বদা সংকীর্ণতার প্রকাশ নয় বরং সমৃদ্ধির উৎসমুখ, অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে তাই লক্ষ করা যায়। ভাষার এই অন্তর্শীলা শক্তিমান বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি চিন্তাবিদগণের লেখার ও কথায় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভাষার এই-শক্তি একান্ত ভাবেই স্থানিক, অর্থাৎ ভূখণ্ড ও জাতিবৈশিষ্ট্য ঘিরে এর গুণগত উৎকর্ষের প্রকাশ। এখানে আন্তর্জাতিক বোধের স্থান কিছুটা সংকীর্ণ। এই প্রসঙ্গেই আইরিশ কবি ইয়েটস-এর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বহু-পরিচিত মন্তব্য মনে পড়ে যায়। আপাত বিচারে তার উক্তি যতই অপ্রিয় বা তিক্ত মনে হোক না কেন, বিশেষ অর্থে সেই বক্তব্যের সত্যতা অনস্বীকার্য। আমরা একমত যে যত বড় প্রতিভাবান কবি বা সাহিত্যিক হোন না কেন মাতৃভাষায় তার পক্ষে শিল্প সৃষ্টিতে যে গুণগত উৎকর্ষ সাধন সম্ভব বিদেশী ভাষায় সেদিক থেকে সেই উচ্চতায় উত্তরণ সম্ভব নয়। আবার ভাষাগত দিক থেকে নির্দিষ্ট জাতির মানুষ ক্রমশ ছোট হয়ে আসা এই পৃথিবীতে শিশুকাল থেকে অন্য ভাষার সাহচর্যে ও জবানীতে রপ্ত হতে হতে জীবন গড়ে তুললে সেই ভাষায়ই তার পক্ষে পারঙ্গমতা প্রদর্শন সম্ভব, ভাষাটিও তখন তার আপন হয়ে যায়। বহু কথিত বিশ্ব নাগরিকত্ব অর্জন কঠিন নয় ঠিকই, কিন্তু বিশ্বভাষাভাষিত্ব অর্জন সম্ভবত আয়ত্তের বাইরে, তা আপনি বিভিন্ন ভাষায় যতই পণ্ডিত হোন না কেন। এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই আমাদের ভাষাচেতনা ও সমাজচেতনার প্রচ্ছদ বিচার করতে হয়।

ভাষার সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বন্ধন দেশ ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত উপাদান রূপে বিবেচিত হওয়ার যে যোগ্যতা রাখে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সেজন্য প্রমাণ হাতড়ে বেড়াবার প্রয়োজন হয় না। জার্মান ভাষাভাষী মানুষ আজ রাজনৈতিক বিভেদ দূরে সরিয়ে বার্লিন প্রাচীরের প্রতীকী বাধা অতিক্রম করে এই যে একাকার হয়ে যেতে চাইছে এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐক্যমত কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুই কোরিয়া সম্পর্কেও এই একই কথা সম্ভবত অমূলক নয়। আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রভেদ যত গভীরই হোক না কেন বাইরের শক্তিমান রাজনীতির প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে পারলে উভয়ের মিলন আপত অসম্ভব ঠিকই একদিন সম্ভব হতে পারে।

একই ভাষায় পরস্পরের সাথে কথা বলার আনন্দ যে ইস্পাতকঠিন সেতুবন্ধন রচনা করে থাকে তার প্রমাণ মেলে স্বদেশের বাইরে অবস্থানকালে। তেমনি মাতৃভাষায় সাহিত্যের রস আস্বাদনে যে মানসিক নৈকট্য গড়ে ওঠে কিংবা নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চায় যে ঐতিহ্য সূত্র গড়ে ওঠে তার তুলনা কোথায়? এমনকি বিশেষ পরিবেশে ব্যক্তিক প্রেম কিংবা আন্তর্জাতিক আদর্শের ঐক্য ভাষা চেতনার ঐক্যমতের কাছে কখনো কখনো হার মানতে বাধ্য হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় ভাষার মাধ্যমে স্বদেশভূমির এতটা গভীর পৌঁছে যায় যে তার সাথে সাময়িক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে তাকে চৈতন্যে ফিরে পাবার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠতে পারে, এমন কি তাকে ফিরে পেতেও হয়।

ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির যোগসূত্রটির শক্তি আমাদের দেশেও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য উদাহরণ রূপে প্রতিষ্ঠিত। দেশ জাতি ভাষা, এককথায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রশ্নে, অস্বীকারের উপায় নেই যে, আমরা এক বিস্ময়কর সমাপনের সাক্ষর রাখতে পেরেছি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যার সূচনা একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে তার আপাত পরিণতি। একদা পরাক্রান্ত ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক হাতিয়ার ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তা-বোধের আঘাতে খান খান হয়ে ভেঙে গেল। তাই দেখে রাজনীতি-বিচক্ষণ মানুষ অবাক হননি মোটেই। বরং এটাই যেন স্বাভাবিক ঘটনা।

ভাষাচেতনা এমনি করে সমস্যাসংকুল যেকোন স্বদেশকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, তারপর ভিন্নপথের নিশানা। আমাদের বেলায়ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার চেতনা, তার শুদ্ধ আবেগ আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সুস্থপথ একটি মাইলফলক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, যা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক চেতনায় নিষিক্ত। এর সুফল মূলত নির্ভর করে ব্যবহারকারী রাজনীতির আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার উপর। এই সমাপনটি কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যারা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাদের দু-একজনকে এমন অভিমত প্রকাশ করতে দেখেছি যে '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনেতো নয়ই, '৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনেও স্বতন্ত্র ভূখণ্ড ও ভাষানির্ভর জাতীয়তাবোধের উদ্ভাস সুস্পষ্ট উপাদান হিসেবে উপস্থিত ছিল না। আমার বিবেচনায় এধনের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। বিষয়টির প্রত্যক্ষ উদ্ভাস না ঘটলেও আন্দোলনের মর্মমূলে উল্লেখিত স্বাতন্ত্র্য চেতনা-সমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধের উপাদান ঠিকই উপস্থিত ছিলো। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রমাণ '৫২-র ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি সিন্ধি, বেলুচি ও পশতু ভাষার স্বাধিকারের দাবিতে স্লোগান যা এক অর্থে ভাষাভিত্তিক ও তদানীন্তন প্রদেশভিত্তিক জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। অথচ বাংলার মাটি থেকে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি অন্যদের জন্য উত্থাপনের কোন প্রয়োজন ছিলো না। বলা বাহুল্য, নিছক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধের উদ্ভাস থেকেই এর জন্ম। উদ্ভট হলেও সত্য যে এই দাবি সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের পক্ষ থেকে বড় একটা উচ্চারিত হয়নি। কথাগুলো ভাষা আন্দোলনের গভীরমূলীয় উচ্চারণ।

অন্যদিকে সেই সঙ্গে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন অর্থাৎ অফিসে আদালতে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহারের পক্ষে যে প্রচণ্ড দাবি প্রতিটি মিছিলে সভায় উচ্চারিত হয়েছে, ব্যানারে ফেস্টুনে ঝলসে উঠেছে। তাতো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধেরই মূলকথা এবং সেই লক্ষ্যের প্রাথমিক পর্যায়ও বটে। একে জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে অসম্পৃক্ত মনে করার পেছনে কোনও যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। মা-মাতৃভাষার নিহিত চেতনাই সম্ভবত এদেশে ভাষা আন্দোলনের উৎসমুখ, যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমস্যার বাঁক পেরোতে গুণগত মাত্রা অর্জন করেছে। অর্জন করেছে জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ ধরে সেই বোধের অন্তর্গত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। টানাপোড়েনে ও সুবিধাবাদী নৈরাজ্যে সম্পূর্ণ হতে পারেনি, দ্বিতীয়টিতেও উত্তরণ তাই সহজ হয়ে উঠছে না। আপাতত প্রথমটিতেই আমাদের মনোনিবেশ বাঞ্ছনীয় এবং মা-মাতৃভূমি জাতীয় দাবি নিহিত সংকীর্ণতা, তার উগ্র স্বাদেশিকতার রূঢ় চরিত্র ইত্যাদি সমালোচনাযোগ্য বিষয় হিসেবে মনে রেখেই আমাদের বিশ্বাস, মা-মাতৃভূমি চেতনাধৃত রাজনীতি সম্ভবত সীমাবদ্ধ বৃত্তে হলেও আমাদের কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিশ্ব রাজনীতির উত্তপ্ত পরিবেশের দিকে তাকিয়ে বিশেষভাবে কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক সমস্যার দিকে চোখ রেখে একটি কথাই বার বার মনে হয়, ভূখণ্ড ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধানের পূর্বশর্তে সমৃদ্ধ। স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সব কটি কোণ পরিপূর্ণ হবার পরই শুধু নতুন রাজনৈতিক চেতনার যাত্রাপথ নির্দেশিত হতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথ নিশ্চিত হতে পারে।

অস্বীকার করা কঠিন যে আমাদের দেশে ওই প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটিই তো শুরু থেকে নানা মাতৃভাষার ত্রয়ী চেতনা আমাদের উভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্যে করতে পারে। অর্থাৎ এদেশের আদি ও অকৃত্রিম প্রক্রিয়া—সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিতে তথা রাজনৈতিক সাফল্য উত্তরণ।

একুশ শতকে বাংলা ভাষা

রফিকুল ইসলাম

একুশ শতকে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কী? নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে বাংলা ভাষার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিগত সহস্রাব্দে বাংলা ভাষার গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মনে আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের বিশ্ব এতই ভিন্ন যে, অতীত গৌরব আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে পারছে না। এটা ঠিক যে, বিশ শতকে বাংলাভাষীরা পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, স্থায়ী বা অস্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলেছে এবং স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সাধ্যমতো বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলা ভাষা, সাহিত্য তথা সংস্কৃতির চর্চা করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলা ভাষার স্থান এখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যানুপাতে চতুর্থ আর একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু অতীতের অর্জন সর্বদা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিয়ামক নয়। একুশ শতকে বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং আকাশ সংস্কৃতির দাপটে পৃথিবীর ছোট-বড়ো অনেক ভাষার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। বাংলা ভাষাও ওই সংকট থেকে মুক্ত নয়। বাংলা ভাষা আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের একক বা অন্যতম স্বীকৃত সরকারি ভাষা; এর বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই বাঙালির বসবাস সেখান থেকেই বাংলা পত্রপত্রিকা, বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে বিশ্বজুড়ে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঢাকা ও কলকাতার বাংলা পত্রিকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালিরা পড়তে পারছে। এ সবকিছু সম্ভবপর হয়েছে বাংলা ভাষা আন্দোলন থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে। বহির্বিশ্বে অবস্থানকারী বাংলাদেশের মানুষ প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা এই কাজটি করে যাচ্ছে একুশ ও একাত্তরের চেতনায় অভিষিক্ত হয়ে। এই চেতনা যদি জাগ্রত থাকে, বাংলাদেশ যদি ওই চেতনার দ্বারাই পরিচালিত হয় তাহলে এই ধারা বজায় থাকবে আশা করা যায়। আর উৎস যদি শুকিয়ে যায় প্রবাহ তখন হারিয়ে যাবে, প্রবাসী বাঙালি তাদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী বাঙালিরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহির্বিশ্বে বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। কারণ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অতীত-গৌরব কলকাতা-কেন্দ্রিক হলেও ভবিষ্যৎ-গৌরব নির্ভরশীল ঢাকার ওপর। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে কলকাতা, আগরতলা, শিলচর, করিমগঞ্জেও বাংলাভাষার অবস্থা হবে আরো নাজুক। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ভবিষ্যতের ওপরই নির্ভর করছে একুশ শতকের বিশ্বের বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ।

বিশ্বায়ন, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক তথ্য-প্রবাহের যুগে পৃথিবীর কয়টি দেশ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে— সে-প্রশ্ন আজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু সংখ্যাধিক্যের কারণে হয়ত চীনা ও স্প্যানিশ ভাষা আর আপসহীন ভাষাপ্রেমের কারণে ইউরোপের ফরাসি, জার্মানি, ইতালীয়, রুশ ভাষা, মধ্যপ্রাচ্যে আরবি, ফারসি আর হিব্রু ভাষা আত্মরক্ষা করতে পারবে। জাপানি ভাষা আত্মরক্ষা করবে অর্থনৈতিক শক্তির বলে। ইংরেজি ভাষা যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে আন্তর্জাতিক 'লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা' বা 'বিশ্ব যোগাযোগের' ভাষা সেহেতু এ ভাষার প্রভুত্ব সব ভাষাকেই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাষারূপে ইংরেজি ভাষা একদিন ছিল 'প্রভুর ভাষা' আর একুশ শতকে এ ভাষা পরিণত হয়েছে 'প্রভুর ভাষা' রূপে। বিশ্বের অধিকাংশ ভাষাকে বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার যূপকাষ্ঠে বলি হতে হচ্ছে।

ইংরেজি ভাষা এখন শিখতে হচ্ছে প্রাণের দায়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্পরূপে। ইংরেজি ভাষাকে এখন যেসব দেশের দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষার মাধ্যমে বা অবশ্য পাঠ্য করা করা হচ্ছে তা করা হচ্ছে মাতৃভাষার বিনিময়ে। মাতৃভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শেখা যায় তাহলে সেটা হল সম্পদ আর যদি মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে তা করতে হয় তাহলে তা হয় অভিশাপ। যে অভিশাপের কবলে আজ উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ জর্জরিত। ভারত ও পাকিস্তান বহুভাষী দেশ; ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ভারতে হিন্দি আর পাকিস্তানে উর্দু ভাষা একক সরকারি ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা আসলে ইংরেজি। 'ইন্ডিয়ান ইংলিশ' এখন বিশ্বস্বীকৃত, বিট্রিশ আমলে না হলেও স্বাধীন ভারতে গত পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে 'ভারতীয় ইংরেজি ভাষায়' রচিত সাহিত্য বেশকিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। পাকিস্তানে কিন্তু ইংরেজি বা উর্দু ভাষায় রচিত সাহিত্য বিকশিত হতে পারেনি, কারণ পাকিস্তানের প্রধান তিনটি ভাষা পাঞ্জাবি, সিন্ধি ও পশতু। উর্দু হচ্ছে করাচি মহানগরীর মোহাজেরদের ভাষা; উর্দুসাহিত্যের বিকাশ তুলনামূলকভাবে বর্তমানে ভারতে অধিক, কারণ ভারতে উর্দুর যেমন পশ্চাৎভূমি রয়েছে পাকিস্তানে তেমনটি নেই।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকরা মূলত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কিন্তু ইউরোপে বহু জাতির বসবাস এবং ইউরোপ অনেক রাষ্ট্র ভাষা দ্বারা বিভক্ত। ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপ নিরাপত্তা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের

পথে দৃঢ়গতিতে অগ্রসরমান কিন্তু ইউরোডলারের মতো কোনো ইউরো ফোন বা সর্বজনগ্রাহ্য ইউরোপীয় ভাষার সৃষ্টি হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক ভাষা নেই। ইংরেজি ভাষা এতদিনে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার দুর্গে হানা দিতে শুরু করেছে। এখন আর শুধু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো (সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড) নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি, জার্মানি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশরাও ইংরেজি ভাষা শিখছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইউরোপের দেশগুলো ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো তাদের মাতৃভাষা পরিবর্তন করে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করছে। তারা তাদের দেশ চালাচ্ছে নিজেদের ভাষায় আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য কাজের ভাষা হিসেবে শিখছে ইংরেজি। একুশ শতকের প্রথম দশকে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোতে (ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড) যত ছাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করছে তার চেয়ে অধিকসংখ্যক ছাত্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জাম্বিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা প্রভৃতি দেশে ইংরেজি ভাষা শিখছে। এশিয়া মহাদেশে তিনটি মাত্র দেশ—ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মাতৃভাষার বিকল্পরূপে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেছে; আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। ব্যতিক্রম আরব ও ইরান। তারা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা শিখছে না। ভারতে হিন্দি ভাষার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান হাতিয়ার ইংরেজি। পাকিস্তানে উর্দুভাষার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ নেই, কারণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবির মাতৃভাষার প্রতি হীনম্মন্যতা এবং উর্দুভাষা-প্রীতি। উপমহাদেশের আদিবাসীদের ভাষাগুলো আজ চরমভাবে বিপন্ন, প্রথম প্রতিবেশী দেশীয় ভাষা আর বিদেশী ইংরেজি ভাষা দ্বারা যেখানেই আদিবাসী সেখানেই তাদের ধর্মান্তর, ভাষান্তর, বর্ণমালা পরিবর্তন করার জন্য কোনো না কোনো পাশ্চাত্য এনজিও এবং ধর্মযাজক বর্তমান। এভাবে অনেক আদিবাসী জাতিসত্তা নিজেদের চিরাচরিত ধর্ম, ভাষা, বর্ণমালা ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম, ইংরেজি ভাষা ও রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করেছে। একুশ শতকের রূঢ় বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, তথ্যবিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা; পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের ষাট থেকে আশি ভাগ ইংরেজি ভাষায় সঞ্চিত, সুতরাং যতই অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছিত হোক নতুন শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে কম্পিউটারের মতো ইংরেজি ভাষাও শিখতে হবে, জানতে হবে। কম্পিউটার যেমন বর্তমানে একটি প্রযুক্তি মাত্র নয় বরং অনিবার্য কৃৎকৌশল, ইংরেজিও আর আজ ভাষা মাত্র নয় বরং অনিবার্য প্রযুক্তি। কাজেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিশ্বে ইংরেজি ভাষা অপরিহার্য কিন্তু তা কি মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে না মাতৃভাষার পরিপূরকরূপে? ইংরেজি ভাষা যতক্ষণ মাতৃভাষার পরিপূরক ততক্ষণ তা সহায়ক, কিন্তু যখন তা বিকল্প তখন তা ধ্বংসাত্মক। একটা দেশের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষার মাধ্যম, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা মাতৃভাষা রেখে বিদেশী ভাষা শেখা যায়, যেমন শিখছে চীন বা জাপান। কিন্তু ভাষা যেহেতু এক একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সে কারণে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে বিদেশী ভাষার সাহায্যে দেশ-পরিচালনার চেষ্টা করলে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী নবস্বাধীন ও প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর মধ্যে সে প্রবণতা অধিকতর লক্ষণীয়। ফলে এসব দেশের জাতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রয়াস ও প্রক্রিয়া বিশ শতকে দেখা গিয়েছিল একুশ শতকে এসে তা পরিত্যক্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একুশ শতকের পৃথিবীকে এক ভাষাভাষী ও এক সংস্কৃতির ভুবনে পরিণত করার প্রয়াস বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং আকাশ-সংস্কৃতি বিকিরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলছে বলে মনে হয়।

নতুন শতক ও সহস্রাব্দের শুরু থেকে পৃথিবীর পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের যে বৈচিত্র্য তা বিলোপসাধনের নীলনকশা নিপুণভাবে রূপায়িত হচ্ছে, এক পৃথিবীর স্বপ্ন বহু মনীষী দেখেছেন, পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধান ছিল তার মূল কথা আর একুশ শতকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় যে পৃথিবী সৃষ্টি হতে চলেছে তা হচ্ছে মানুষের জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বৈচিত্র্যের লোপসাধন এবং বিশ্বকে একটিমাত্র প্রভুর অধীনস্থ করার অপচেষ্টা। একুশ শতকের পৃথিবীতে সেসব জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে– যারা নিজেদের জাতিসত্তা, জাতীয় স্বাধীনতা, ভাষা-সাহিত্য, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল এবং রক্ষণশীল, নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে যার কোনো হীনম্মন্যতা নেই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাৎপর্যহীন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া। এক একটি সম্প্রদায়ের ভাষা তাদের সংস্কৃতির মুখপাত্র এবং সভ্যতার পূর্বশর্ত। পৃথিবীজুড়ে আজ একটি একক ভাষার প্রভুত্ব স্থাপনের এবং অগণিত মাতৃভাষা ধ্বংস সাধনের যে প্রক্রিয়া চলছে তার ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে আর সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে যদি বাংলা ভাষা কোনো বিদেশী ভাষার অধীন হয়ে পড়ে তাহলে বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা তাৎপর্য হারাবে। একুশ শতকের বিশ্বে পৃথিবীর চতুর্থ স্থানে অবস্থানকারী বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে যদি একুশ ও একাত্তরের চেতনায় অগ্রগতি করতে পারে তাহলে বহির্বিশ্বেও তার প্রভাব পড়বে এবং বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা বিশ্বে নিজের অবস্থানকে মজবুত করে নিতে পারবে। আর যদি বাংলা ভাষা নিজ দেশে পরবাসী হয় তাহলে বিশ্বায়নের ডামাডোলে সে ভাষার অস্তিত্ব একুশ শতকের মধ্যেই লোক পেয়ে যাবে। বাংলা ভাষাহীন বাংলাদেশ কি কল্পনা করা যায়?

মহাভাষার অহঙ্কার

আযিজুল হক

বাংলাদেশের স্থায়ী গর্বগুলোর মধ্যে তার ভাষা অন্যতম। কখনো কখনো তা প্রধান বলেও চিহ্নিত হয়েছে। এমন কি, যুগসন্ধিক্ষণে এই ভাষাই এক আমোঘ নিয়ামক-শক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সার্বলৌকিক মুক্তি অর্জনের শক্তি ভাষান্তরে নিহিত, এমন সচেতন ভ্রান্তিতে আমরা বহু শতাব্দী ভুগেছি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক শাস্তিভোগ ও পরিত্রাণলাভের ঘটনার মধ্যে ব্যাধি ও তার নিরাময়ের রহস্য এক আয়ুতেই নাটকীয় ভঙ্গিতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। মধুসূদনের মেধাচর্চার পরিণাম এ-কারণে কেবল আমাদের জন্যে শুভ হয়নি যে, তিনি বহু-ভাষাবিদ হতে পেরেছিলেন এবং ইংরেজের চাইতেও ভালো ও বেশি ইংরেজি জানতেন, তাঁর মতো কিংবা তাঁর চাইতেও বড়ো ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ এবং বহুভাষাবিদ এদেশে অনেক জন্মেছেন। একাধারে পাঁচ-সাতটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে দোভাষী-বহুভাষীর দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করতে পারেন এমন চাকুরীজীবীর সংখ্যা আধুনিককালে আমাদের সমাজেও বাড়ছে। কিন্তু এর সঙ্গে প্রকৃত মধুসূদন দত্তের সংখ্যাবৃদ্ধির কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে আমরা বাংলাভাষার প্রধান তিন মুক্তিদাতা হিসেবে গণ্য করে থাকি। কিন্তু তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্যে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনও তাঁদের ছিল। সপ্তসমুদ্রের প্রবাহসমূহকে আকর্ষণের ক্ষমতা মধুসূদনের ছিল। কিন্তু তাঁর বড়ো কৃতিত্ব এই যে, সে-সব প্রবাহকে ধারণ করার ক্ষমতা যে বাংলাভাষার আছে তা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং তা পেরে আনন্দ-উত্তেজনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। *মেঘনাদবধকাব্য* সেই উত্তেজনারই এক শিল্পিত পরিণাম। আমাদের এবং রবীন্দ্রনাথেরও সৌভাগ্য, তিনি উপমহাদেশের অন্য ভাষাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেননি। তারো চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, তিনি ভাষান্তর প্রতিভাচর্চা করেননি। নতুবা তাঁর সুজনশীলতা অসঙ্গত অনুর্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত বীজের মতোই অপচয়িত হতে পারতো। কতোখানি অপচয়িত হতে পারতো তার প্রমাণ খানিকটা নিজেই তিনি প্রদর্শন করেছেন তাঁর অনূদিত কবিতার সংকলন ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার এই অসাধারণত্বের উপলব্ধি তখনি মাত্র সম্পূর্ণ হবে যখন একই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে, সেই দুর্লভ প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলবার উপযুক্ততা এ-উপমহাদেশে বাংলাভাষার মতো এটি আঞ্চলিক অথচ অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন ভাষারই মাত্র ছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রচণ্ডতম ক্রোধ ও সিন্ধুতরঙ্গস্ফীত অভিমান উভয়কেই এই ভাষা কী অবলীলাক্রমেই না ধারণ করেছে। নজরুল আবিষ্কার করেছিলেন, জঙ্গী-পুরুষ ও জঙ্গীজনতার গর্জনশীল কণ্ঠকে বাংলাভাষা কতোখানি উষ্ণতা ও উত্তরঙ্গতা দিতে পারে। বাংলাভাষা এখন কেবল এ-কারণেই আমাদের প্রধান গর্বের বিষয় নয় যে, এমন সব ব্যক্তিপ্রতিভার আত্মপ্রকাশে ও বিকাশে সে উপযুক্ত মাধ্যম-সহায়তা দান করেছিল। গুরুতর সত্য, এক যুগসন্ধিক্ষণে একটি জাতির জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তুলতে সে একটি চাক্ষুষ মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যক্তির আত্মবিকাশের জন্যে যেমন মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন, জাতির আত্মবিকাশের জন্যে তেমনি মাতৃভাষাই তার একমাত্র অবলম্বন। নিজেদের এই সার্বিক শুভপরিণাম অর্জনের জন্যে তাই সর্বাধিক জাতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের এবং সেজন্যে তাঁকে অধিক উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব সম্পর্কে কেবল আমাদেরকেই সচেতন থাকতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান শিল্পী মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখদের উজ্জ্বলতর অবদান মাথায় নিয়ে আমরা কখনো কখনো অতিরিক্ত গর্ভভারে নিথর-নিশ্চল থাকলেও সত্য এই যে, ভাষা তাদের কাল ও কীর্তিকে অতিক্রম করে ইতোমধ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। মূলত তাঁরা ছিলেন সাহিত্যিক এবং তাঁদের ভাষাচর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য। কিন্তু কেবল কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও গানের ভাষা দিয়ে দেশ চলতে পারে না। বস্তুত সে-ভাবে চলেওনি। এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগর্বে আমরা যখন স্ফীত হয়ে উঠি, তখনো ভুলে থাকি না যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত কখনো এ-ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যথাপ্রয়োজন ব্যবহৃত হবারই সুযোগ পায়নি। অবশ্য সেই পরাধীন অতীতগুলোতেও যখনি যে-ক্ষেত্রে যে-ভাবে যতোটুকু সীমিত সুযোগ পেয়েছে, বা নেপথ্যে যতোটুকু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সে তৈরি করে নিতে পেরেছে, প্রতিকূলতা ও অসহযোগিতা সত্ত্বেও নিয়েছে বটে, ভাষা তখনি সেখানে নিজের প্রয়োগ-সাফল্য আনার সাধনায় বিলম্ব করেনি। সীমিত ক্ষেত্রের এই সীমিত সুযোগের সদ্ব্যবহারই বাংলাভাষার অসীম সম্ভাবনাময়তাকে সুচিহ্নিত করেছে। অতঃপর বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এ নয় যে ন'-দশ কোটি মানুষ এ-ভাষায় কথা বলে এবং শত শত বছর ধরে এদেশের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলো এ-ভাষাতেই এ-ভাবে মিটিয়ে এসেছে। কারণ জনসংখ্যার বিপুলতা বা বৃদ্ধি ভাষার গুণাগুণ বিচারের মানদণ্ড নয় এবং কালের দৈর্ঘ্যও নির্ভরযোগ্য আশ্বাস নয়। কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও মনোগত ও বস্তুগত প্রয়োজনসমূহ যদি বৃত্তবন্দি থাকে, তবে ভাষার সীমিত শব্দাবলী, শব্দরূপ সনাতন বাক্যগঠনপদ্ধতি ও গতানুগতিক বাকভঙ্গি দিয়েই সকল কাজ একরকম সেরে ফেলা যায়। আসলে

প্রয়োজনসমূহের বিবর্তন ও বিস্তারের উৎস মানুষের প্রাণশক্তি। বলা বাহুল্য, ভাষা নিজেই একটা মৌলিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটির বিবর্তন ও বিস্তারও তাই সচল সামাজিক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা এবং আত্মপ্রকাশের বিবর্তনশীল ও বিস্তারমুখী আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও বিকাশকে রুদ্ধ করে রাখা এবং একই উদ্দেশ্যে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এবং সকল উচ্চপর্যায়ের গবেষণাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহারের ওপর বিধিগত নিষিদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করার বিষয়টি ছিল বিদেশী শাসকদের প্রধান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এ-সব ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ককে যেভাবেই উর্বর করে তোলা হোক না কেন, আমাদের প্রতিভাকে যেভাবেই ফলপ্রসূ এবং আকাঙ্ক্ষাকে যেভাবেই উত্তুঙ্গ করে তোলা হোক না কেন, শাসকশ্রেণীর সুনির্দিষ্ট স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সুপরিকল্পিতভাবেই তা করা হয়েছে। ফলে আমাদের সকল উর্বরতা, সকল ফলপ্রসূতা ও সকল উত্তুঙ্গতা সঙ্গে করে নিয়েই কাণ্ড-শাখা-শিকড় সমেত আমরা তাদের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছি।

কিন্তু বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করাটা আবশ্যিকভাবে প্রশাসননির্ভর ছিল না, কিংবা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক ছিল না। স্বনির্ভর সাহিত্যের বাহন হবার এই কিঞ্চিৎ সুযোগ নিয়েই বাংলাভাষা রাজপ্রহরী-রক্ষিত রাজপথের বাইরে উন্মুক্ত জনপদে একটা স্বতন্ত্র পায়ে চলা পথ তৈরী করে নিয়েছিল। আর এ পথেই সাহিত্যের, সাহিত্যিক প্রতিভার এবং সাহিত্যিক ভাষার বিকাশ ঘটতে পেরেছিল। এমন কি, অবদমিত প্রাণশক্তি ও বৃহত্তর সমাজচেতনা এ পথেই মুক্তির জন্যে যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছিল। সে-সব কালে রচিত নাটক, প্রহসন, কবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীত, বিদেশী-সাহিত্যের অনুবাদ এবং সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধ প্রস্তাবনাসমূহ এ-উৎকণ্ঠার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃত কথা, সাহিত্যের নেপথ্য ভুবনেই, অনাড়ম্বরে হলেও ভাষা প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক ও মনীষী-প্রাবন্ধিকদের হাতে খানিকটা যত্নের সঙ্গে লালিত হয়েছে। বিদেশী ভাষানীতি বাধ্যতামূলক এবং রাজানুকূল্যে ক্ষমতা মর্যাদা ও মেদবৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত না হলে, স্বদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা উজ্জ্বল প্রতিভাসমূহের বিকাশ এবং স্বদেশের চিত্তমুক্তি ঘটাতে পারতো। লক্ষ করা যেতে পারে যে, ইংরেজি উন্মত্ত মধুসূদন দত্ত, যে-কোনো কারণেই হোক, কিছুকালের জন্যে তাঁর মাতৃ-ভাষার ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বহু মধুসূদন কখনো ফেরেননি। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি অংশ মাত্র কয়েক বছরের জন্যেই কাব্যগত নাট্যগত, ভাষাশ্রয়ে ফিরে এসেছিল, বাকি সমগ্র অংশ তাঁর আত্মবিনষ্টির পথেই নিঃশেষিত হয়েছিল।

তবে কেবলি এমন খণ্ডিত ধারণায় সুস্থির থাকা সমীচীন নয় যে, সাহিত্য-শিল্পচিন্তা ছাড়া বাংলাভাষাকে অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা ও জ্ঞান বিনিময়ের উপযুক্ত বাহন করে গড়ে তুলবার সাধনা অতীতে কিছুমাত্র হয়নি। খাঁটি কথা, সাহিত্যের ভাবরস সৃজনের জন্য নয় বরং বস্তুবাদী জ্ঞান-চিন্তা, তত্ত্ব-তথ্য ও তর্ক-বিতর্কমূলক বিষয়াদির প্রকাশ ও প্রচারের জন্যেই বাংলাতে আদিগদ্যের সূচনা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের চাকুরীগত প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতবর্গ প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বাংলা গদ্য সঙ্কীর্ণ অর্থে ও অভিপ্রায়ে প্রশাসনিক স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর দ্বিতীয় দশক থেকে ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বসীমা অতিক্রম করে ওই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক সাহিত্যের শিল্পরস ও শ্রীমণ্ডিত এক সম্ভাবনাময় ভাষারীতি হিসেবে তার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত বাংলা গদ্য, আড়ষ্টভাবে হলেও, প্রধানত সেই মৌলিক বিষয়গুলোকে বহন করেই সচল থেকেছে। বাংলা গদ্য মূলত তখন শাস্ত্রব্যাখ্যা দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক, বিচিত্র বিদেশী বিষয়ের অনুবাদ, সমাজ-সংস্কার-মূলক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা বিষয়ক রচনা-প্রস্তাবাদি, কিংবা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ তথ্য, ঘটনা এবং মতামত ব্যাখ্যা বর্ণনার এক নেটিভ বাহন। অতঃপর ঐতিহাসিক কারণেই, প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য এ-দু'য়ের দার্শনিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক ও জীবনমূল্যায়নগত ভিন্ন-অভিন্ন আদর্শের পারস্পরিক উষ্ণ সংস্পর্শতা ও দ্বন্দ্ব এবং একই সঙ্গে বিজিত ও বিজেতা শাসক ও শাসিত, এ-দুয়ের মধ্যকার সমস্যা ও সংঘর্ষ ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট এবং শিক্ষিত সমাজের চিন্তা, বোধ ও আকাঙ্ক্ষার জগতে সেগুলো প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকলে, তার শুভাশুভ মানসিক প্রতিক্রিয়াসমূহের সঙ্গে আত্মলগ্ন হয়ে বাংলা গদ্যও প্রকাশক্ষমতা অর্জনে অধিক তৎপর এবং ক্রমান্বয়ে তা ঋজু, তীক্ষ্ণ প্রাঞ্জল গতিশীল ও আধুনিক হয়ে ওঠে। গদ্যের এই গতি বিংশ শতাব্দীতে এসে আরো তীব্রতা ও বহুমুখীনতা লাভ করেছে। এই শতাব্দীতেই মানুষের ভাব ও জ্ঞানের জগতে বৈপ্লবিক সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। দ্রুত ও বিচিত্রভাবে বিবর্তিত বিশ্বজ্ঞান, জীবনচেতনা ও মূল্যবোধ দার্শনিক চিন্তা-ধারণা এবং শিল্প-সাহিত্যের রূপ ও রসোপলব্ধিকে ধারণ এবং সেগুলোকে সত্যসম্মত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশের জন্যে আমাদের চিন্তাশীল লেখক, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদেরকেও নতুন নতুন শব্দ আহরণ, নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি, শব্দে নতুন অর্থব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য আরোপ এবং বাক্যের নতুন গঠন-কৌশল, বাকরীতি ও প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবনে তৎপর হতে হয়েছে। এখন আধুনিক পৃথিবীর জটিলতম ও সূক্ষ্মতম তন্ময় ও মন্ময় জ্ঞান-চিন্তা-অনুভব-চেতনা প্রকাশের ক্ষমতায় ও শিল্পায়নের কৃতিত্বে নিঃসন্দেহে বাংলাভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর অন্যতম।

তবে **নিবর্তনশীল** বৈজ্ঞানিক ধারণা-ভাবনা-সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা-ভাষার তুমুল-প্রচারিত সেই মানদৈন্যটির স্বরূপ কী? আসলে, দেহের বিশেষ একটি অঙ্গের পুষ্টিহীনতা, বিবশতা ও ক্ষমতাক্ষীণতার কারণ সে অঙ্গের স্বাধীন আন্দোলনে অবরোধ এবং তাতে রক্তসঞ্চালনে রুদ্ধতা সৃষ্টি। নতুবা বহুভাষাজ্ঞানী মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক 'মহাভাষার উপাদানসমূহে সমৃদ্ধ' বলে সনাক্তকৃত বাংলাভাষার এই প্রত্যঙ্গ-বিকাশ-মন্থরতার হেতু কী? লোক-প্রকৃতিতে উদ্ভূত এবং লোকসমাজে প্রলালিত বাংলাভাষা তার প্রধান শিকড়টিকে এক ঐতিহাসিক স্তরে এসে প্রাচ্যের ধাতুসমৃদ্ধ প্রধান একটি ধ্রুপদী ভাষার হৃৎপিণ্ডের গভীরে প্রোথিত করেছে। তারপর একে একে সে তার শাখামূলগুলো সঞ্চালিত করেছে দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইয়োরোপের বিশিষ্ট ভাষা-প্রকৃতিগুলোর অভ্যন্তরে, সম্প্রসারিত করেছে আপন উৎসভূমির সীমারেখাকে। বিদেশী যে কোনো ভাষার শব্দকে প্রয়োজনবোধে স্বীকরণ করে নেবার ক্ষমতা তার প্রশ্নাতীত। বাংলাভাষার প্রতিটি বর্ণ স্বকীয় ও স্থানীয় ধ্বনিচরিত্র-স্বভাবের বিশ্বস্ত অভিন্নতায় ও বিভ্রান্তিহীন সততায় পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলোর যে-কোনো বর্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার সমস্ত বর্ণ-বর্গ কাঠামোর প্রতিটি বর্ণের জন্যে ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক স্থায়ী আসন-পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা ও ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের বিবেচনায় অনুসরণযোগ্য এক আদর্শ বিশেষ। তবু এ-ভাষা বিশেষ ক্ষেত্রে এতোদিনেও চূড়ান্তভাবে তন্নিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারলো না কেন? সোল্লাসে প্রচারিত তার সেই লঘুযোগ্যতার রহস্য অবশ্য দুর্বোধ্য নয়।

বিজ্ঞান, কারিগরি বা প্রযুক্তিবিদ্যা কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের মতো ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বগৃহে বা কেবল গ্রন্থাগারে স্বেচ্ছাপাঠ, স্বেচ্ছাচর্চা ও স্বেচ্ছায়ত্তের বিষয় নয়। এ সবের সর্চা বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, এবং আর্থিক সুনিশ্চয়তা যন্ত্রপাতি এবং একান্তভাবে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর। পরাধীন যুগ-শতাব্দীগুলোতে উপনিবেশবাদী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে এসব আনুকূল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা বরাবরই স্বপ্নচর্চায় পর্যবসিত হয়েছে। শাসিতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মারণাস্ত্রে পরিণত হতে পারে, তাদের এই জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে শাসন শোষণের সাজানো ব্যবস্থা, নিজেদের অস্তিত্বের নিরাপত্তা ও রাজকীয় শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, এ অভিজ্ঞতা ও আশঙ্কা শাসকশ্রেণীর কম ছিল না। ফলে আমাদের তরুণদের বৈজ্ঞানিক মেধাকে তারা তাদেরই প্রয়োজনে সুপরিকল্পিতভাবে ভিন্নখাতে ব্যবহার করেছে। আর একই উদ্দেশ্যে সীমিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তাদের এই উপনিবেশটিতে, উচ্চ পর্যায়ে যে প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন, অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রিত গবেষণার ব্যবস্থা মহাশম্বুক গতিতে অনুমোদিত হয়েছিল, সেখানে বাংলাভাষার প্রবেশাধিকারের প্রশ্নটি ছিল একেবারেই অবান্তর। নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে অনুশীলনের জন্যে স্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচন ও স্বাধীনভাবে তা চর্চার সঙ্গে স্বাধীনভাবে ভাষা ব্যবহার এবং ঈপ্সিত ভাষা রূপ, শব্দাবলী ও শব্দরূপের বিষয়োপযোগী হয়ে উঠবার প্রশ্নটি জড়িত। এই স্বাধীনতার অভাবই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার মানদৈন্যকে বজায় রেখেছে। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন মূলত ভাবপ্রধান ও চিন্তাপ্রধান ও মনোগত বিষয় বলে সেগুলোর চর্চা প্রতিষ্ঠানিক শর্তাবলী ও বস্তুবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বা বস্তুধর্মের বিধি-বিধানকে ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে প্রচারিত হতে পারে। এমন কি সেগুলোর স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবারও সুযোগ আছে। সাহিত্যের ভাষা তো অহরহ ব্যক্তিমনের স্পর্শে পূর্বতামুক্ত ও সাধারণত্বমুক্ত হতেই আগ্রহী। এর মধ্যে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মর্যাদা আবার অভিধানের প্রতি আগ্রহী। এর মধ্যে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মর্যাদা আবার অভিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে নয় বরং তা তার বিদ্রোহিতার, বিশ্বাসঘাতকতায় এবং তার নতুন অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টির স্বাধীনতা গ্রহণে। তার অভিসার বস্তুসত্য, বস্তুধর্ম ও নিয়মকে অতিক্রম করে ভাবসত্য ও শিল্পসত্যের অভিমুখে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কীর্ণভাবে বিষয়বদ্ধ, বিশেষীকৃতভাবে প্রতীকী, সাঙ্কেতিক ও গাণিতিক, এখানে শব্দমাত্রেই প্রমাণ, প্রমাণিত প্রমাণ, নিখুঁত ওজনে নির্ধারিত নিরেট মসৃণ ওজন-পাথর। এর ভাষার শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট ও বৃত্তবন্দি, বাক্য ও পদের চরিত্র বা আচরণ গাণিতিক-জ্যামিতিক প্রথার সুনিয়ন্ত্রিত। শব্দকে রঞ্জিতকরণ, তার স্বেচ্ছাব্যবহার এবং ভাষায় শিল্পছলনা আরোপ এখানে নিষিদ্ধ। শব্দার্থ কেবল বিষয়গতভাবে সিদ্ধ, সঙ্কীর্ণ বিষয়গতভাবেই প্রযুক্ত হবার যোগ্য। তার এই সিদ্ধতা ও যোগ্যতা কেবল প্রাপ্ত, আবিষ্কৃত, উদ্ঘাটিত, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত বস্তুসত্য, বস্তুধর্ম ও বস্তু-নিয়মের প্রতি, সংশ্লিষ্ট করণ-ক্রিয়া-পদ্ধতির প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বস্ততায়। বিজ্ঞানে ব্যক্তির ভাষা অচল। দেশের বিজ্ঞানী-সমাজ স্বীকৃত ভাষার একটি সাধারণ রূপই সেখানে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত।

কিন্তু ভাষার সেই রূপটি, তা যতোই সঙ্কীর্ণ বিষয়ানুগত এবং চর্চিত বৈশিষ্ট্যে অনন্য হোক না কেন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তার মাতৃনাভিমূল থেকেই। বিশেষ বিষয়চেতনা মূর্ত হবার জন্যে ভাষার বিশেষ একটি রূপাবয়বকে দাবি করে। এই অবয়ব মাতৃসত্তায় গঠিত হলেই কেবল তাতে উষ্ণ রক্ত সঞ্চালিত হতে পারে। কৃত্রিম দেহই প্রাণের সমাধিগৃহ। কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রাণই কেবল ধাতুনির্মিত দেহে নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজনের হুকুমে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সচল থাকে।

আসলে ভাষাগত সকল বিশেষ রূপই গড়ে ওঠে মাতৃভাষার জঠর থেকে। বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক বিদ্যায় অতি উন্নত অথচ পরস্পর ভাষাগত ঐক্যবিহীন দেশগুলোতেও ভাষার একান্ত তন্ময়রূপগুলো সে-ভাবেই গড়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে মাতৃভাষা আমাদের সেদিনকার সেই পিপাসার্ত শৈশবকে স্তন্যদান করতে গিয়ে রাজকীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও

গবেষণাগারের রুদ্ধ দরোজায় নিষ্ফল কষাঘাত করে বারবার ফিরে এসেছে। কারণ, উদ্দেশ্যমূলক কৃত্রিম দক্ষ মানুষ তৈরীর কারখানায় অকৃত্রিম প্রাণরসের যোগাযোগ নিষিদ্ধ ছিল। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরু থেকেই এদেশে বাংলাভাষায় নিয়মিত পাক্ষিক ও মাসিক বিজ্ঞান-সাময়িকী প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। পরবর্তী একশো বছর ধরে বিজ্ঞানব্রতী ভাষাভিজ্ঞ গবেষকবৃন্দ স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণের চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে-সব শ্রম ও সাফল্য বাস্তব ক্ষেত্রে বিবেচিতই হয়নি। সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও গবেষণা-ব্যবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় যে কজন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষাবিদ অসাধারণ মেধা, জ্ঞান ও উদ্ভাবনী-শক্তিতে দেশের এবং বিশ্ববিজ্ঞানী সমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেই উচ্চতম সকল স্তরের সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ধারণা-ভাবনা প্রকাশের যোগ্যতা বাংলাভাষার আছে বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে এবং সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের অপরিহার্যতার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বাংলাভাষায় রচিত এবং নিরীক্ষামূলক পরিভাষায় সমৃদ্ধ তাঁদের বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণানিবন্ধ, গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকাদি কম্পাসের কাঁটার মতো এখনো আমাদের সমুদ্রযাত্রার নির্দিষ্ট দিগন্ত নির্দেশ করছে; আমাদের ভাবের মুক্তি, জ্ঞানের মুক্তি ও কাজের মুক্তি ঘরের ভাষায় নয়, পরের ভাষায়, এই আদি ভ্রান্তিকে তো ইতোমধ্যে একেবারে অতিক্রম করে যাবার কথা। দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের জীবনের মুক্তিকে যাঁরা পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে উপলব্ধি করেন, মাতৃভাষার সাফল্যে তাঁদের সংশয় নেই। তবে বিপরীত ও বিকল্প বিশ্বাস কখনো কখনো ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মূর্খতাকে এবং সাধুতার অভাবকে প্রকট করে তুলতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলাভাষাকে রক্ষা করার, লালন করার এবং তাকে এক অন্তহীন শুভ-পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশেরই। এ-ধারণাটি এখন ব্যক্তিগত, শ্রেণী-গত ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে অতিক্রম করে রাষ্ট্রগত ও জাতিগত চেতনায় এসে সুস্থির হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষার-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একুশে ফেব্রুয়ারি

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

মাতৃভাষা একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জনগোষ্ঠীর ভাষার মৃত্যু হলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে, যদিও মানুষগুলো জনমিতির বিচারে অস্তিত্বহীন হয় না। যে জাতির মাতৃভাষা স্বীকৃত তার আত্মপরিচয়ও স্বীকৃত। অর্থাৎ মাতৃভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সূচক। দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে এমন একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ ইংরেজ অধ্যাপক মরিস জোন্স বলেন, ভাষা একটি গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ আত্মপরিচয়ের চিহ্ন এবং গোষ্ঠীটির সীমানা চিহ্নিতকারী।

কিন্তু ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতও আছে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লা বঁ-র বক্তব্য হলো, ভাষার চেয়ে অধিক জটিল, যৌক্তিক এবং বিস্ময়কর আর কী হতে পারে? সবচে জ্ঞানী শিক্ষাবিদ এবং সবচে সম্মানিত বৈয়াকরণ হয়ত ভাষা ব্যবহারের বিধিসমূহ নির্দেশ করতে পারেন; কিন্তু তারা ভাষা তৈরি করতে অক্ষম। এমন মন্তব্যে ভাষা বিকাশের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যা প্রভাবিত করা বিশেষজ্ঞদেরও সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হওয়া ছাড়াও ভাষার অন্য মাত্রা ও ভূমিকা আছে। এমন একটি মাত্রা ও ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন ভাষার রাজনীতিকরণ হয়, বা ভাষার প্রশ্নে যখন রাজনীতি উত্তাল হয় এবং প্রশাসন নানা ধরনের আকস্মিক ও বিস্ময়কর নীতি অনুসরণ করে বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় এমন ব্যাপার ঘটেছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে। অবশ্য উল্লেখ্য, এমন ঘটনা ঘটেছে এই অঞ্চলে উপনিবেশ আমলে ও উপনিবেশ শাসনের অবসানের পর। এই চারটি দেশেই ভাষার রাজনীতি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রশাসন ও সংবিধানকে প্রভাবিত করেছে। এমন একটি নিরিখে দক্ষিণ এশিয়া একটি বিশেষভাবে চিহ্নিত অঞ্চল হতে পারে।

ভাষার রাজনীতির অনিবার্য ফল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছে, এবং যার ধারাবাহিকতায় ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বলাবাহুল্য, ভাষার রাজনীতিসম্পৃক্ত এমন ঘটনাবলি থেকে দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বের রাজনীতির কারণে স্বাধীন ভারতের অনেক রাজ্যের প্রশাসনিক সীমানা বদলাতে হয়েছে। অন্যদিকে ভাষার রাজনীতি শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান জাতিগত সংঘাতের জন্ম দিয়েছে (শোনা যাচ্ছে এমন সংঘাতের সামরিক সমাধান প্রায় আসন্ন) অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক ঘটনা ও অঘটনের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা প্রসঙ্গটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য স্মর্তব্য, পাকিস্তান-বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির ভাষা আন্দোলনটিই বড়োমাপের ভাষার রাজনীতির দৃষ্টান্ত। এই বড়োমাপের ঘটনাটির ইতিহাস ও ঐতিহাসিক পটভূমি দীর্ঘ ও গভীর। আর এমন পটভূমির সঙ্গে জড়িয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক চেতনা উৎসারিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা হয়, বাঙালির বাংলাভাষার আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনা ১৯৪৭-৪৮ থেকে। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত তা-ই। কিন্তু এমন ইতিহাসের গভীর শেকড় আছে। একটি প্রশ্নের প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে গিয়ে এই গভীর ইতিহাস অনিবার্য হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ১৯৪৭এর জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করেন; এবং তার ফলে পাকিস্তানে ভাষার রাজনীতির সূচনা হয়। আরো বলা হয়, এর ফলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলার সাংবিধানিক দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অনিবার্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো : ড. জিয়াউদ্দীন কেন উর্দুর প্রস্তাব করেছিলেন? এটা তো তার অজানা থাকার কথা নয় যে, পাকিস্তানের মাত্র দু-ভাগ নাগরিক উর্দু ভাষায় কথা বলতো। উপরন্তু তিনি যে, এটা জানতেন না যে, ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলা নাগরিকরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ড. জিয়াউদ্দীন ছিলেন একজন উপাচার্য, কৃতবিদ্য মানুষ।

কাজেই তিনি যে এসব তথ্য জানবেন তা যৌক্তিকভাবেই অনুমান করতে হয়। আর এটা তো জানা কথা যে, তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে আবেগধর্মী সস্তা কথা বলবেন। কাজেই প্রশ্ন এখন; তার মুখ থেকে কোন যুক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রস্তাব উচ্চারিত হয়েছিল।

ড. জিয়াউদ্দীন রাজনীতিবিদ না হলেও তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনালগ্ন একজন সচেতন মুসলমান ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক যে মানসজগৎ তা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তিনি আপন ভুবনে মগ্ন থাকবেন তা নয়। উপরন্তু তার বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার তীর্থভূমি।

যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ও কারণে ড. জিয়াউদ্দীনের এমন প্রস্তাব ছিল তার শেকড় ১৮৬৭তে। সে বছর বেনারসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভারতের অভিন্ন ভাষা হিসেবে হিন্দির সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং বেনারসের উর্দুভাষী মুসলমানদের ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের সিদ্ধান্তে এটাও ছিল যে, ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হলে রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি। তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্তিমিত ও সীমিত আকারে হলেও দৃশ্যমান আন্দোলন শুরু হয়, কাজেই বেনারসের মুসলমান সম্প্রদায় উর্দু ভাষা রক্ষার রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। এভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষার রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। এমন ভাষার রাজনীতি ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণও করলো। হিন্দি হিন্দুর ভাষা; আর উর্দু মুসলমানের। অর্থাৎ ভাষারও ধর্ম তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু জানা কথা, হিন্দু ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল দিল্লি এলাকায় এক সংকর ভাষা হিসেবে; এবং তা মুঘল আমলে। হিন্দি ভাষায় ছিল স্থানীয় অনেক উপভাষার সংমিশ্রণ। ভাষাটি অভিন্ন ভাষা হিসেবে চালু হয়, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে এসে ভাষাটিতে শাসকের ফার্সি ভাষার অনেক শব্দ ছিল। বলা যায়, মুঘল আমলের হিন্দি ভাষায় ফার্সি শব্দের প্রাধান্য ছিল। উপনিবেশ আমলে এই সংকর ভাষাটির নাম হয় হিন্দুস্তানি। সারা হিন্দুস্তানেই অভিন্ন ভাষা হিসেবে চালু ছিল হিন্দুস্তানি। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকেই হিন্দুস্তানি ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণ শুরু হয়। হিন্দুস্তানি ভাষা দুভাগ হয়ে যায়। হিন্দুস্তানি থেকে ফার্সি শব্দ তুলে দিয়ে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করে দেবনাগরি লিপিতে লেখা শুরু হলে তা হয়ে ওঠে হিন্দুর ভাষা হিন্দি। আর বিপরীতে আরবি/ফার্সি শব্দসহ আরবি লিপির হিন্দুস্তানি হলো মুলসমানের উর্দু ভাষা। অর্থাৎ ভাষার সাম্প্রদায়িক চারিত্র ধারণ শুরু হলো এভাবে। ১৯৪৭এ ড. জিয়াউদ্দীনের প্রস্তাবের পটভূমি ছিল এটাই। পাকিস্তানের কতভাগ নাগরিক উর্দু ভাষায় কথা বলতো তা নয়, বরং মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সূচক ও দ্যোতক ভাষা হিসেবে উর্দুকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি প্রস্তাবটি করেছিলেন।

১৮৬৭-র বেনারস সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন মুসলমান-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরপর থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় আর কোনো ব্যাপারে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে না। অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের সূচনা বেনারস ভিত্তিক ভাষার রাজনীতি থেকেই। এখন হয়ত দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য বৈরিতা নেই কিন্তু তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কারণে ভবিষ্যতে এই বৈরিতা ভয়ানক বেড়ে যাবে। তিনি ততদিন বেঁচে থাকবেন, তিনি তা দেখবেন।' বেনারসের ঘটনাটি প্রসঙ্গে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনীকার হেক্টর বলিথো লিখেছিলেন, এভাবেই সূচিত হলো মানুষগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, যার উত্তরসূরি হয়েছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, যদিও বহু বছর পর তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তার নিয়তি ছিল সৈয়দ আহমেদ-এর এই বিরক্তিকর ভবিষ্যদ্বাণী রূপায়ণ করা। সুতরাং ১৯৪৮-এ তিনি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ও কার্জন হলে বক্তৃতায় পূর্বপ্রস্তুত সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেছিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনিও ড. জিয়াউদ্দীনের মতো পাকিস্তানের উর্দুভাষী নাগরিকের অনুপাত নয়, বিবেচনায় নিয়েছিলেন মুসলমান গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উর্দুকে। অবশ্য জীবনসায়াহ্নে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল।

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর মাতৃভাষাকে ধর্মীয় আবেগের কারণে রাষ্ট্রভাষা বলতে গিয়ে ভাষার রাজনীতি ও প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিবাদী/প্রতিরোধী বাঙালির ভাষা-আন্দোলন উসকে দেয়া হয়েছিল। সফল ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে বাঙালিদের জন্য ছাড় দিয়ে ১৯৫৬-র সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি না হলে, তুমুল ভাষাআন্দোলন না চললে এই সংবিধানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুই স্থান পেত। অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি পাকিস্তানের সংবিধানের চরিত্র বদলে প্রভাবিত করেছিল।

শ্রীলঙ্কায় ঘটেছিল উল্টো ঘটনা, যা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক ছিল বৈকি। দেশটির সিংহভাগ মানুষের মাতৃভাষা সিনহালা। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের ভাষা তামিল। জাতিসত্তার বিচারেও তারা তামিল। ১৯৫৬-র সংবিধানে কেবলমাত্র সিহনালাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলো। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের বলভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল; বিপরীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী তামিলদের ভাষা হয়েছিল পরিপ্রেক্ষিত। আর এই সিদ্ধান্তই ছিল তামিল বিদ্রোহের বীজ যা থেকে রাষ্ট্রটিইর মতো মহীরুহের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

ভারতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ১৯৬১-তে আসামের বরাক উপত্যকায় ভাষার দাবিতে আমাদের মতো রক্ত ঝরেছিল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ভারতে ভাষার রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল অন্যরকম। স্বাধীনতার পর রাজ্যগুলোর যে প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ভাষাগোষ্ঠীর আয়তনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। যেমন—মাদ্রাজ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল, তেলেগু, কানাড়া এবং মালয়ালাম ভাষার মানুষ। তেলেগুভাষী মানুষ সর্বপ্রথম ভাষার রাজনীতির সূচনা করে। ১৯৫৩-তে নেহেরুর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ তেলেগুভাষী রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত সরকার

একটি রাজ্য সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশন নিয়োগ করে। ১৯৬৫-তে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যসমূহের সীমানা ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

রাজ্য	ভাষা
মাদ্রাজ (পরে তামলনাড়ু এবং বর্তমান চেন্নাই)	তামিল
কেরালা	মালয়ালাম
মহীশুর	কানাড়া
গুজরাট	গুজরাতি
মহারাষ্ট্র	মারাঠি

১৯৬০-এ পাঞ্জাব বিভক্ত হলো দুটো রাজ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। পাঞ্জাব হলো পাঞ্জাবিভাষিদের রাজ্য; আর হরিয়ানায় থাকলো হিন্দিভাষী।

অবশ্য অভিন্ন ভাষা হলো হিন্দি, অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত ১৮৬৭-তে বেনারসে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে সংবিধানে ভারতের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল পনেরোটি ভাষা: ১) অসমি; ২) বাংলা; ৩) গুজরাতি; ৪) হিন্দি; ৫) কানাড়া; ৬) কাশ্মিরি; ৭) মালয়ালাম; ৮) মারাঠি; ৯) উড়িয়া; ১০) পাঞ্জাবি; ১১) সিন্ধি; ১২) তামিল; ১৩) তেলেগু; ১৪) সংস্কৃত ও ১৫) উর্দু।

জাতিসংঘ নির্ধারিত অনেক দিবস আছে, যা বছরের বিভিন্ন তারিখে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উদ্‌যাপন করে। এমনি একটি হলো, ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, যার উৎস বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-এশিয়া।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সারা বছর না হলেও ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা বাংলাভাষাকে একবার স্মরণ করি। একটা সময় ছিল যখন বাংলাভাষার যোগাযোগটা ছিল শুধু বাংলা সাহিত্যের সাথে, এখন তার ব্যাপ্তি অনেক বেড়েছে। দাপ্তরিক কাজ থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা গবেষণাতেও বাংলাভাষাকে ব্যবহার করতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তির আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে প্রায় নিয়মিতভাবে বাংলাভাষা সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে একাধিক অধিবেশন রাখতে হয়। এই প্রথমবার দেখা যায় ভাষাবিদ এবং প্রযুক্তিবিদরা পাশাপাশি বসে কথা বলছেন, আলোচনা করছেন, তর্ক-বিতর্ক করছেন। বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তি কতটুকু সমৃদ্ধ করেছে কিংবা তার উল্টোটা–তথ্যপ্রযুক্তিকে বাংলাভাষা কতটুকু সমৃদ্ধ করেছে দুটোই এখন আমাদের সবার জন্যে আলোচ্য বিষয়। দুটোই এখন আমাদের জন্যে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তি থেকে বাংলাভাষা কতটুকু সাহায্য পেয়েছে সেটি দেখা তুলনামূলকভাবে সহজ। অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা শুধু একুশের বই মেলার দিকে এক নজর তাকাই তাহলেই বাংলাভাষার জন্যে তথ্যপ্রযুক্তির অবদানটুকু আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সময় একটি বই লেখা বা ছাপানো খুব কঠিন একটা ব্যাপার ছিল। বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং শুরু হবার পর এই দেশের প্রকাশনা শিল্পে আক্ষরিক অর্থে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। শুধু যে, কাজটি সহজ হয়েছে তা নয়, প্রকাশনার গুণগত মানও অনেক বেড়েছে।

তবে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাভাষার এই সেবাটুকু করেছেন তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা। এর মাঝে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা বলতে গেলে কিছুই নেই। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশে যারা রাষ্ট্র চালান তারা দেশের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে ভালবাসেন। বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যে যে প্রমিতকরণের ব্যাপারটির একটা গুরুত্ব থাকতে পারে সেটি কোনোভাবে তাদের বোঝানো সম্ভব হয়নি। অন্য অনেকের সাথে প্রায় দুই যুগ আগে থেকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সবার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছিলাম। বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রমিতকরণ করা সম্ভব হয়নি বলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ইমেইল করার সময় বা ইন্টারনেটে আলাপচারিতা করার সময় ইংরেজি হরফে বাংলা লেখার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে একটি জগাখিচুড়ি স্টাইল তৈরি করেছে। এখন সেটি প্রায় সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর বই মেলার আগে আগে আমি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করি যে, কোনো একজন ইংরেজি হরফে লেখা ইংরেজি বাংলার এই জগা-খিচুঁড়ি ভাষায় একটি বই লিখে এটার আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ফেলবেন।

কম্পিউটারে বাংলাভাষাকে প্রমিতকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের বিন্দুমাত্র গরজ না থাকলেও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বাংলাভাষাভাষী সুধীজনের এ ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। কাজেই পৃথিবীর সকল ভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রমিতকরণের আন্তর্জাতিক উদ্যোগে তারা অংশ নিয়েছেন এবং ইউনিকোডে তারা বাংলাভাষাকে স্থান করিয়ে দিয়েছেন। ভারতে বাংলাভাষার কাছাকাছি অন্যান্য ভাষার সাথে এক ধরনের সমন্বয় করা হয়েছে, কোন বর্ণ রাখা হবে কিংবা কোথায় রাখা হবে সে ব্যাপারে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা ছিল না। এই দেশের মানুষ বাংলাভাষার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছে, একটি দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে একসময় মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, এখন সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনা করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইউনিকোড কনসর্টিয়ামের সদস্য হতে পারেনি। শুধু এয়ারপোর্ট রোডের ডিভাইডার তৈরি করতে এবং ভাঙতে যত টাকা খরচ করা হয়েছে তার একশভাগের এক ভাগ খরচ করেই বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসার্টিয়ামের সদস্য হতে পারত, বাংলাদেশের ভাষাবিদরা কনসর্টিয়ামের সভায় হাজির থেকে প্রমিতকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারতেন।

কিন্তু সেটি ঘটেনি। আমাদের ভাষাবিদেরা মনে করেন 'S'এবং 'ক্ষ' এই দুটি বর্ণের ইউনিকোডে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। তার জন্যে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায় সেই আবেদনটি গ্রহণ করা হবে না এবং ইউনিকোডকে তার বর্তমান রূপেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তবে সবাইকে আশ্বস্ত করিয়ে দেয়ার জন্যে বলা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ বাংলা লেখা, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া করার ব্যাপারে 'S'এবং 'ক্ষ'-কে ইউনিকোডে রাখা বা না রাখার কোনো সম্পর্ক নেই। ইউনিকোডে কোনো যুক্তবর্ণই নেই এবং সেটি থাকার কথাও নয়।

ইউনিকোডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণের ফলে আমাদের নিজেদের প্রমিতকরণের মূল প্রয়োজনটি ফুরিয়েছে। বর্ণের ক্রম কী হবে কিংবা র্ (রেফ), ৎ (খণ্ড ত), ্ (হসন্ত) ব্যবহার করে কিছু কিছু যুক্তাক্ষর তৈরির জটিলতা কীভাবে নিরসন করা যায় এ ধরনের কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউনিকোডকে গ্রহণ করে নিলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তাহলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ নিজেদের ভেতরে বাংলা তথ্য বিনিময় করতে পারবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলা হরফে বাংলা লিখে ইমেইল করতে পারবে—তাদেরকে আর ইংরেজি হরফে বাংলা লিখতে হবে না। আমরা কার্যকর আধুনিক বাংলা অভিধান তৈরি করতে পারব, আমরা বাংলা ভাষায় বিশাল ডাটা-বেস দাঁড় করাতে পারব, সেগুলোর সাথে তথ্য আনা-নেয়া করতে পারব, বাংলায় সত্যিকারের ওয়েব সাইট তৈরি করতে পারব। সম্প্রতি বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বংলা বর্ণক্রম, বানান পদ্ধতি এবং ইউনিকোড কী-বোর্ড প্রমিতকরণ করা হয়েছে। সরকার সেটি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করলে বাংলাভাষার প্রতি আমাদের একটি বড় ঋণ শোধ করা হয়।

খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় যে, ইউনিকোড কী-বোর্ড সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করতে হলে আমাদের লেখার অভ্যাসটুকু খানিকটা পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণ দেবার জন্যে বলা যায়, আমরা এখন 'ভোর' লেখার সময় লিখি ভ-ো-র, ইউনিকোড আমাদের কাছে দাবি করবে—আমরা যেন লিখি ভ-ে া (ওকার)-এর! তবে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা যদি কী-বোর্ড ড্রাইভার তৈরি করে দিতে পারেন যেটি আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেই ঘটতে তথ্য সংরক্ষিত হবে ইউনিকোড নিয়মে, তা হলে অনেকেই সম্ভবত একটু বেশি স্বস্তি অনুভব করবেন। এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমাদের তরুণ প্রযুক্তিবিদদের জন্যে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ। আমরা তার সমাধান দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকব।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাভাষার জন্যে আরো একটি খুব জরুরি কাজ করা প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ। আমরা এই মুহূর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগৎকে যেটুকু দিচ্ছি তার থেকে অনেক বেশি নিচ্ছি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয় ধীরপায়ে, কিন্তু প্রযুক্তি ছুটে চলে লাফিয়ে লাফিয়ে। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা খুব কষ্ট। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এবং যেহেতু ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমরা অনেক সময়েই অসুবিধায় পড়ে যাই। আমাদের নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। তার ম্যানুয়েল থাকে ইংরেজিতে। প্রযুক্তির নানা ধরনের তথ্য থাকে ইংরেজিতে। ইন্টারনেটে সম্ভাব্য সব বিষয়ে খবরাখবর থাকে ইংরেজিতে। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলো সব সময় পৌঁছে দেয়া যায় না। তাই প্রযুক্তির অনেক সহজ বিষয় অকারণেই সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। আমরা যদি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি বের করতে পারতাম আমাদের খুব কাজে লাগত।

আমাদের ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে আমাদের অন্য যে বিষয়ে সাহায্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে OCR বা অপটিক্যাল কেরেক্টার রিকগনিশান সফটওয়্যার। সহজ কথায় বলা যায়, ওয়ার্ড প্রসেসর যেমন লেখার সফটওয়্যার ওসিআর হচ্ছে সে রকম পড়ার সফটওয়্যার। কোনো একটি জায়গায় বাংলা লেখা থাকবে, সেটা স্ক্যান করে নেয়া হলে, সেটা বিশ্লেষণ করে বের করে নেয়া হবে সেখানে কী লেখা হয়েছে। কাজটি মোটেও সহজ নয়, হাতের লেখা থেকে বাংলা বর্ণ শব্দ বা বাক্য পড়ে ফেলা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই কাজটি শুরু করতে হবে ছাপা বাংলা লেখা থেকে। সেই প্রক্রিয়াটি মোটামুটি আয়ত্তে চলে এলে পরবর্তী ধাপ হিসেবে হাতের লেখার মর্মোদ্ধার করার কাজটিতে হাত দেয়া যেতে পারে। বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালনের জন্যেও আমাদের প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করছেন। মনে হয় তারা অনেকদূর এগিয়েও গেছেন। আমার ধারণা আগামী এক বছরের ভেতরে আমরা OCR একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম পেতে পারি, তারপরেও সেটি শতকরা একশ ভাগ নির্ভুলভাবে কাজ করবে সেটি আশা করা একটু অন্যায় হয়ে যাবে। স্ক্যান করে কম্পিউটারে লিখিতভাবে আনার পরেও একজন মানুষকে সেটি পড়তে হবে। ছোটখাটো ভুলত্রুটিগুলি শুদ্ধ করে নিতে হবে। একটি ওসিআর সফটওয়্যার হাতে চলে এলে বাংলাভাষায় লেখা সকল সাহিত্য, সকল তথ্য আমরা ইলেকট্রনিক রূপে পেয়ে যাব। বর্তমানে ব্যবহার কিংবা ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রহ এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই তখন আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। প্রকাশনা শিল্পে সেটি একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যে আরো দুটি বিষয়ে কাজ চলছে, তার একটি হলো বাংলা ভয়েস সিনথেসিস, অন্যটি ভয়েস রিকগনিশান। সহজ করে বলা যায়, বাংলালিপিকে কণ্ঠদান করা এবং বাংলা শুনে সেটিকে লিপিবদ্ধ করা। বাংলায় কিছু লেখা থাকলে সেটাকে পড়ে শোনানোর কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ। ইংরেজি ভাষায় সেরকম সফটওয়্যার আজকাল বেশ সহজেই পাওয়া যায়। বাংলাভাষাতে সে ধরনের সফটওয়্যার ইতোমধ্যে চোখে পড়তে শুরু করেছে। তবে ভয়েস রিকগনিশান সফটওয়্যার নিয়ে গবেষণার কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

এ ধরনের কাজ ছাড়াও কিছু সহজ এবং রুটিন কাজের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। ইউনিকোডভিত্তিক নানা ধরনের ফন্ট এখনো তৈরি হয়নি। খুব দ্রুত এ ধরনের দৃষ্টিনন্দন ফন্ট তৈরি হলে দেশের মানুষ সাথে সাথে সেটি ব্যবহার করতে পারবে। ইংরেজি ওয়ার্ড প্রসেসরের সাথে ইংরেজি অভিধান এতো চমৎকারভাবে সমন্বিত করা হয়েছে যে, আজকাল ইংরেজি ভাষাভাষী নতুন প্রজন্ম ইংরেজি বানান পুরোপুরি ভুলতে বসেছে। যখন কিছুদিন পর ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যার আরো কার্যকর হয়ে কী-বোর্ড বিষয়টিই অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে তখন বানান বলতে আমরা কী বোঝাই সেই বিষয়টিই হয়তো কাউকে বোঝাতে পারব না। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এ ধরনের বিপত্তি হতে পারে। আমাদের দেশেএখনও আমরা সুন্দর হাতের লেখার প্রতিযোগিতা করতে পারি।

আমরা এতক্ষণ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছি বা কীভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। তথ্যপ্রযুক্তি কিভাবে বাংলাভাষার কারণে সমৃদ্ধ হয়েছে সেই বিষয়টিও একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যখনই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করি, সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তিও একটু করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। একটি সময় ছিল যখন ইন্টারনেটে আমরা বাংলায় কোনো তথ্য খুঁজে পেতাম না। ইউনিকোড জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আমরা নানা ধরনের বাংলা তথ্য খুঁজে পেতে শুরু করেছি। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাভাষা পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা মিলিয়ে বাংলাভাষাভাষী মোট মানুষের সংখ্যা প্রায় দুইশ দশ মিলিয়ন (একুশ কোটি)। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সাড়ে তিন শতাংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি তিরিশজন মানুষের মাঝে একজন বাংলায় কথা বলে। কাজেই ইন্টারনেটে বা অন্যান্য তথ্যকেন্দ্রে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের নিজের ভাষায় তাদের তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হলেই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রটি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল বয়ে নেবার ব্যাপারেও এই দেশের সাধারণ মানুষ কিংবা এনজিও বড় ভূমিকা রাখছে। "পল্লী তথ্য কেন্দ্র" জাতীয় একটি ভাবনা ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যন্ত গ্রামে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে স্থানীয় মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে সেটাকে স্বাবলম্বী করে তোলার কিছু চমৎকার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এইসব কেন্দ্রে যেহেতু তথ্যগুলো বাংলায় রাখতে হবে, কাজেই খুব ধীরে ধীরে বাংলাভাষায় তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠছে। যদি এই ধরনের একটি উদ্যোগকে দেশের সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়া যায় তাহলে আমরা সম্ভবত বাংলাভাষা এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাঝে সমন্বয়ের একটি খুব বড় উদাহরণ দেখতে পাব। মানুষের জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির অসম বণ্টনের ব্যাপারটিকে আজকাল ডিজিটাল ডিভাইড নামের একটি গালভরা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে যদি "পল্লী তথ্য কেন্দ্র" জাতীয় উদ্যোগ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খানিকটা হলেও পৌঁছে দেয়া যায় তাহলেও এই দেশের মানুষকে ডিজিটাল ডিজিটাল নামের অবহেলা থেকে মুক্তি পাবার প্রক্রিয়াটি শুরু করা যাবে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষাকে কিংবা বাংলাভাষাতে তথ্যপ্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলেও অন্য একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার চলে আসে। বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষই কম্পিউটার বলতে শুধু তার হার্ডওয়্যারটিকে বোঝায়, কিন্তু একটি কম্পিউটারকে ব্যবহার করার জন্য যে অপারেটিং সিস্টেম এবং আনুষঙ্গিক সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় সেটিকে ধর্তব্যের মাঝেই আনে না। কারণ তারা সেটি অর্থ দিয়ে কিনে না, কম্পিউটারের সাথে সেটি বিনামূল্যে পেয়ে যায়। এগুলোকে পাইরেটেড সফটওয়্যার বলে এবং এগুলো দেশীয় বা আন্তর্জাতিক যে-কোনো নিয়মে বেআইনি। এই সফটওয়্যারগুলো যদি নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে কিনতে হতো একটি কম্পিউটারের দাম দুই, তিন কিংবা আরো কয়েক গুণ বেশি বেড়ে যেতো। এই দেশে যে রকম পাইরেটেড বই, সিডি এবং ভিসিডি প্রকাশ্যে বিক্রি হয় সেভাবে সফটওয়্যারও বিক্রি হয়–এটি যে অন্যায় বা আইনবিরুদ্ধ কারো মাথায় সেই চিন্তাটিও নেই।

এবারে একটা ভয়াবহ আশঙ্কার কথা বলা যাক। আগে হোক পরে হোক আমাদের দেশে বেআইনি সফটওয়্যার ব্যবহার বন্ধ হবে। এটি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোনো দেশের চাপের কারণে বন্ধ করতে হয় তাহলে সেটি হঠাৎ করে ঘটে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই দেশগুলো চাপ দিয়ে কী করতে পারে পাকিস্তান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করে যে মানুষটি একজন জাতীয় নেতার সম্মান পেয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে দেশের সকল ভাবমূর্তি জলাঞ্জলি দিয়ে সেই মানুষটিকেই রাতারাতি একজন তৃতীয় শ্রেণীর তস্কর হিসেবে সবার সামনে পরিচিত করা হলো। কাজেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোনো একটি দেশ যদি বাংলাদেশকে পাইরেটেড সফটওয়্যারকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে তাহলে রাতারাতি বাংলাদেশের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। তখন তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা দূরে থাকুক বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়টিই টিকে থাকতে পারবে কি না সেটি নিয়েই বড় সন্দেহ রয়েছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্যে এই ধরনের বিপদের ঝুঁকি নেয়া খুব বিপজ্জনক।

সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের ঝুঁকি নেয়ার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এই সমস্যার খুব সহজ একটি সমাধান রয়েছে। সেটি হচ্ছে কম্পিউটারের সফটওয়্যার হিসেবে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার গ্রহণ করা। সোজা ভাষায় কম্পিউটারে মাইক্রোসফট কোম্পানির ওইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা নানা ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার না করে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এবং তার উপর গড়ে উঠা আনুষঙ্গিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা। লিনাক্স (বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার) সফটওয়্যারটি পৃথিবীর নির্লোভ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের তৈরি করা একটি অপারেটিং সিস্টেম। এটি অত্যন্ত সুগঠিত এবং শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম। এটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এর সোর্স-কোড সবার জন্যে উন্মুক্ত এবং যে কেউ এটিকে পরিমার্জন বা পরিশীলন করতে পারেন। আগে একটি সময় ছিল যখন লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জন্যে সহজে ব্যবহারযোগ্য কোনো ভাল সফটওয়্যার ছিল না। এখন আর সে সমস্যা নেই। দৈনন্দিন ব্যবহার বা নেটওয়ার্কিং করার উপযোগী সফল ধরনের সফটওয়্যার এখন লিনাক্সে পাওয়া যায় এবং জাতীয়ভাবে সেটা গ্রহণ করাই হবে আমাদের জন্যে সবচেয়ে সুচিন্তিত সমাধান। পৃথিবীর অনেক দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি কারণে : প্রথমত, তারা একটি অর্থলোলুপ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না এবং দ্বিতীয়ত, সেটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি সাশ্রয়ী। একটি জিনিস তো বিনামূল্য থেকে কমমূল্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা যদি ওপেন সোর্স প্রযুক্তিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করি তাহলে সেটাকে আমরা বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করে দিতে পারব। দেহের একেবারে সাধারণ মানুষের ব্যবহার করার জন্যে এর চাইতে সহজে কোনো উপায় নেই। সারা পৃথিবীই এখন আন্তর্জাতিকভাবে বা জাতীয়ভাবে ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনতে চাইছে। ওপেন সোর্স প্রযুক্তি গ্রহণ করা হচ্ছে সেইদিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।

কাজেই বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তিতে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করার জন্যে আমাদের কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত বা দিগনির্দেশনার সময় চলে এসেছে। যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটি গ্রহণ করা হয় সেটি হবে চমৎকার। যদি করা না হয় তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে হলেও এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

আগেও এই দেশের প্রযুক্তিবিদেরা সেটি করেছেন, এখন কেন পারবেন না?

বাংলাদেশের আদিবাসী ও আদিবাসী ভাষা

সৌরভ সিকদার

বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও প্রায় ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পৃথিবীর ৪টি প্রধান ভাষা-পরিবারের প্রায় ৩০টি তারা ব্যবহার করে। এর মধ্যে কিছু ভাষা পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও অনেক ভাষাই পরস্পর এতটা ঘনিষ্ঠ যে, এগুলোকে উপভাষাই বলতে হয়। যেমন তনচঙ্গা মূলত চাকমা ভাষার উপভাষা। অনুরূপভাবে রাখাইন মারমা ভাষার, লালং বা পাত্র গারো ভাষার এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরি এবং হাজং বাংলার উপভাষা। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষার সংখ্যা ২৬টি। যদিও একটি ওয়েবসাইটে (Ethnologue, Languages of Bangladesh) বাংলাদেশে বাংলাসহ মোট ৩৭টি ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ওয়েব সাইটে আসামিজ, বার্মিজ, চিটাগোনিয়ান, হাকা-চীন, রিয়াং, সিলেটি প্রভৃতিকে পৃথক ভাষা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

জর্জ গ্রিয়ারসনের *Linguistic Survey of India* (LSI) প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ অঞ্চলের আদিবাসী ভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। ফলে ভাষাগুলোর শ্রেণীকরণসহ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং তুলনামূলক কোন আলোচনা হয়নি। সুগত চাকমা (২০০০) তাঁর এম ফিল অভিসন্দর্ভে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপভাষাগুলির প্রাথমিক শ্রেণীকরণের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া গত প্রায় একশ বৎসরে ভাষাগুলোতে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে LSI-এ উল্লেখিত অনেক তথ্যের সঙ্গে মাঠ-গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের মিল নেই । আমরা এখানে বাংলাদেশে আদিবাসী ভাষাগুলোর একটি পরিচিতি দেবার চেষ্টা করেছি :

ভাষা-পরিবার	ভাষিক সংখ্যা	ভাষার সংখ্যা
অস্ট্রো-এশিয়াটিক	১২৫০০০	৪
চীনা-তিব্বতি	৫৩১০০০	১৫
দ্রাবিড়	২৫০০০	১
ইন্দো-ইউরোপিয়	১২৬৩১৮৪৯৬	৬

১. ভাষা পরিবার: অস্ট্রো-এশিয়াটিক

পৃথিবীতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক (অ-এ) জাতির জনসংখ্যা কম হলেও বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এদের বসবাস। সুদুর আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারত-চীন পর্যন্ত এ জাতির বসবাস। ভাষাবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণায় জানা গেছে বাংলার আদি বা সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল অস্ট্রিক পরিবারের ভাষা। ভারতবর্ষে প্রচলিত এই ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত ভাষাসমূহ অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার ভাষা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহ আবার দুটি শাখায় বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে মোন-খমের ও মুন্ডারি।

ক. মোন-খমের শাখা : বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় একশটিরও অধিক ভাষা মোন-খমের শাখা-র অন্তর্ভূক্ত। ভাষাগুলি পূর্ব-ভারত থেকে ভিয়েতনাম মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া এবং ইউনান-চীন থেকে মালয়েশিয়া ও আন্দামান সাগরের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে এ শাখার ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হরো খাসিয়া বা খাসি। এই খাসিয়া ভাষারই একটি উপভাষিক বৈচিত্র্য মনে করা হয় লিঙ্গাম ভাষাকে।

খাসিয়া বা খাসি ভাষা : বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মঙ্গোলয়েড খাসিয়া জাতির ভাষা। বর্তমানে খাসিয়া জনসংখ্যা প্রায় ১২,২৮০ জন। ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক খাসি ভাষায় কথা বলে। খাসিয়া ভাষার সাথে বার্মার মোঁয়ে (Mon), পলং (Palng) ভাষার এবং উপমহাদেশের তালাং, খেড়, সুক, আনাম, খামেন, চোয়েম, ক্ষং, লেমেত, ওয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। খাসি ভাষা মৌখিক ভাষা। এ ভাষার কোন নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তবে ১৮১২ সালে কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামক একজন ধর্মযাজক সর্বপ্রথম বাংলা বর্ণমালায় ও খাসি ভাষায় নিউ টেস্টামেন্ট বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৮৩৮ সালে পরে ওয়েলস মিশনারি দলের টমাস জোনস রোমান হরফে খাসিয়া ভাষা লেখার প্রচলন করেন। বর্তমানে খাসি ভাষা রোমান হরফেই লেখা হয়। খাসি ভাষার উপভাষা রয়েছে বেশ কয়েকটি।

১.খ. মুন্ডারি শাখা : অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদ মুন্ডারি শাখাকে অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও ভিন্ন মতও রয়েছে। Hevesy-র মতে, এই Finno-Ugrian ভাষা গোষ্ঠীর কোন এক জাতি সুদূর অতীতে হয়ত ভারতবর্ষে চলে আসে এবং তাদের

আনা ভাষা পরবর্তীতে স্থানীয় অন্য কোন ভাষার প্রভাবে মুন্ডারি শাখার ভাষার সৃষ্টি করে। কিন্তু Finno-Ugrian ভাষা-ভাষীদের অতীতে ভারতবর্ষে আগমনের কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে প্রচলিত মুন্ডারি শাখার ভাষাসমূহের আলোচনায় দেখা যায়-অর্ধস্বর, স্বর, ব্যঞ্জন ছাড়াও অর্ধ-ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়। আর্য ভাষার মতো ঘোষ, অঘোষ অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি পাওয়া যায়।

সাঁওতালি ভাষা: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে দুই লক্ষাধিক সাঁওতাল বাস করে। ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপাল মিলিয়ে পৃথিবীতে ৫২ লক্ষ লোক সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। হাজার হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা সাঁওতালি ভাষার কোন নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তবে খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাতে প্রথম সাঁওতালি ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হয় রোমান হরফে। ১৮৬৯ সালে ভারতের সাঁওতাল পরগনার লুথারিয়ান মিশনে স্থাপিত একটি ছাপাখানা থেকে প্রথম সাঁওতাল ভাষার ব্যাকরণ ও অন্যান্য বই প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে রঘুনাথ মুর্মু 'অলচিকি' নামে সাঁওতালি বর্ণমালা তৈরি করে এবং তার সরকারি স্বীকৃতিও লাভ করে। বাংলাদেশে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে রাজশাহী জেলায় (বর্ষাপাড়া গ্রামে) সাঁওতালি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে মূলত বাংলা হরফেই সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে তৈরি গ্রন্থের নাম *পাহেল পুথি*। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশী শব্দগুলো প্রধানত সাঁওতালি ও মুন্ডা ভাষা থেকে আগত।

মুণ্ডা ভাষা: বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ২১৩২ (১৯৯১ আদমশুমারি অনুযায়ী) জন মুণ্ডা বসবাস করে। ভারতে এদের সংখ্যা ৪ লক্ষ। মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। মুণ্ডা ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের মুণ্ডারি শাখার অন্তর্গত। প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে পিজিন ভাষা হিসেবে মুণ্ডা ভাষার প্রচলন হয়েছিল। বাংলা ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (ক্রিয়াপদের লিঙ্গহীনতা, শব্দদ্বৈত ইত্যাদি) মুণ্ডা ভাষাজাত বলে ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। রূপতাত্ত্বিক (Morphological) দিক থেকে মুণ্ডা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৮৪; ১১৫) : 'আকৃতিগত দিক থেকে মুণ্ডা ভাষা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। ভারতীয় আর্য ভাষার মতো এই অস্তিত্ব বর্তমান। অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনিও এই ভাষায় শ্রুত হয়। শব্দগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু অক্ষর বিশিষ্ট। ভাষার তিন বচন দুই লিঙ্গ। শব্দের গুরুত্ব আরোপের জন্য শব্দদ্বিত্বের প্রয়োগ বহুল প্রচলিত'। মুণ্ডা ভাষার কোন নিজস্ব হরফ নেই। এজন্য এদের কোন লিখিত সাহিত্য নেই। মুখে মুখে এ ভাষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে টিকে আছে। যদিও বর্তমানে এ ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

২. ভাষা-পরিবার: চীনা-তিব্বতি

ভাষাবিজ্ঞানীরা চীনা-তিব্বতি (Sino-Tibetan) পরিবারের ভাষাসমূহের বিস্তৃতি মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে বার্মা এবং বালিষ্টান থেকে পিকিং পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এ পরিবারে প্রায় ২০০-৩০০ ভাষা রয়েছে। ভাষা-পরিবারের নাম চীনা-তিব্বতি হলেও এ পরিবারের ভাষাগুলি *তিব্বতি-বর্মি* (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত। এই ভাষা পরিবার দুটি ভাগে বিভক্ত (ভারতবর্ষের বাইরে আরো একটি ভাগ রয়েছে যার নাম 'য়েনিসি') চাইনিজ বা চীনা, এবং তিব্বতি-বর্মি। তিব্বতি-বর্মি আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত – একটি টিবেটো-হিমালয়ান ও অপরটি আসাম-বার্মিজ। আসাম-বার্মিজ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত – বোডো, নাগা, কুকি-চীন, কাচিন, বার্মিজ ইত্যাদি।

২. ক বোডো শাখা: মান্দি বা গারো, ককবোরক (ত্রিপুরা), পাত্র, প্রভৃতি ভাষাসমূহ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

মান্দি ভাষা: বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, মধুপুর গারো পাহাড় সংলগ্ন ও সিলেট অঞ্চলে মান্দিদের (গারো) বসবাস। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক এই মান্দি জাতির স্বীকৃত ভাষার নাম 'আচিক বা মান্দি ভাষা'। মান্দিদের মোট ১৩টি গোত্রের মধ্যে বাংলাদেশের ৭টি গোত্রের কথা জানা যায়। গোত্র ভেদে মান্দিদের আলাদা আলাদা উপভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা না থাকলেও রোমান হরফ ব্যবহৃত হয় ব্যাপকভাবে। জন থুসিন রিছিল, ডানিয়েল আর রুরাম, মার্টিন রেমা, প্রদীপ সাংমা নামের চারজন গবেষক আলাদা আলাদা গবেষণার মাধ্যমে চার ধরনের বর্ণমালার উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমানে প্রধানত রোমান এবং সীমিত পর্যায়ে বাংলা হরফের প্রয়োগ হচ্ছে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বসবাসরত গারোরা নিজ ভাষাতেই পড়াশুনা ও সাহিত্য রচনা করে থাকে।

লিঙ্গাম : লিঙ্গামরা নিজেদেরকে পৃথক জাতিসত্তার মানুষ দাবি করলেও গবেষকদের মতে এরা মূলত খাসি এবং গারোদের সম্মলিত একটি জাতি। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই উভয় দলের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা না করে মন্তব্য করা উচিত নয়। বাংলাদেশের নেত্রকোনা-ময়মনসিংহের গারো পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলেই প্রধানত লিঙ্গামদের বাস। তবে এদের সঠিক জনসংখ্যা বিষয়ে কোন তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। লিঙ্গাম ছাড়াও এদেরকে মিগাম, মারামস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ভারতের গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশে বসবাসকারী লিঙ্গামদের মোট জনসংখ্যা ২৭,৪৭৮ (১৯৯১)।

ককবোরক ভাষা: ত্রিপুরা জাতির ভাষার নাম ককবোরক যার অর্থ মানুষের ভাষা। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসরত প্রায় দশ লক্ষ ত্রিপুরা ককবরক ভাষায় কথা বলে। মধ্যযুগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী শাসিত পূর্ববঙ্গের এক বিশাল এলাকায় ককবরক ভাষা প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরাদের অবস্থান তৃতীয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদের জনসংখ্যা ৭৯৭৭২ জন। টিপরা এবং ত্রিপুরা উভয়ই মূলত একই জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে ত্রিপুরারা মূলত রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলায় বাস করে। এছাড়াও চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা বাস করেন। তবে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, আসাম, ও অরুণাচলে এরা বাস করে। ত্রিপুরারা তাদের ভাষাকে বলে *ককবোরক*। ককবোরক শব্দের অর্থ মানুষের ভাষা। এটি মূলত সিনো-টিবেটান (Sino-Tibetan) পরিবারের ভোট-বর্মি শাখার বোডো দলভুক্ত।

কোচ ভাষা : কোচ সম্প্রদায়ের আদিম আবাসস্থল কোচবিহারে। তবে নাগপুর ও আসামেও তারা বাস করতো। বাংলাদেশে ঢাকার উত্তরে গাজীপুর জেলায় তারা প্রথম প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের মধুপুর, গাজীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, এবং রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে কোচরা বাস করে। কোচ সম্প্রদায় কত বছর যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করছে তা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কোচদের পৃথক ভাষা রয়েছে। কিন্তু তাদের ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়নি। কোচদের ভাষা বাংলা ভাষা থেকে স্বতন্ত্র্য। কোচ সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন লিপি নেই। ভাষিক গঠন ও কাঠামো দেখে মনে হয় চীনা-তিব্বতি পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার বোড়ো দলভুক্ত।

পাত্র বা লালং : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের অন্যতম অংশ হলো পাত্র। সিলেট জেলার সদর ও গোয়াইনঘাট থানাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত ২৩টি গ্রামে প্রায় ৪০২টি পরিবারের ২০৩৩ জন আদিবাসী পাত্র বস করে। কারো কারো মতে, এদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজার হবে। পাত্ররা নিজেদের ভাষার নাম লালং বলে এবং নিজেদের লালং জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের ভাষার সঙ্গে গারোদের ভাষার মিল লক্ষ করা যায় – 'ইহারা খাসিয়া ও জৈয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বসতি করিতেছি। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে ইহারা ভিমাপুরের (কাছাড়ের) নিকট বাস করিত' (অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি; ১৯১০)।

এরা কখনো পাত্র, কখনও পাত্তর, আবার কখনও পাথর ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। কাঠ পুড়িয়ে অঙ্গারিক কয়লা বিক্রির মাধ্যমে জীবন-যাপন করতো বলেই তাদেরকে বলা হত পাথর। কালের বিবর্তনের ধারায় ও ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তনে এ পাথরই হয়েছে পাত্র (পাথর>পাতর>পাত্র)।

সিলেটে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাত্রদের আলাদা সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষা থাকলেও সে ভাষার কোন বর্ণমালা নেই। জাতিগত ভাবে পাত্ররা "বোড়া" জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে পণ্ডিতরা অনুমান করে থাকেন।

রাজবংশি : ভারতের কোচবিহার অঞ্চল থেকে আগত কোচ এবং পলিয়া জাতির মিশ্রণজাত সম্প্রদায় হচ্ছে রাজবংশি (অশোক বিশ্বাস; ২০০৩; ৫৩)। হাচিসন ও ডালটনের লেখা থেকে জানা যায় ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোচ রাজা হাজোরের বংশধরগণ 'কোচ' ত্যাগ করে 'রাজবংশী' গ্রহণ করে। দৈহিক গঠনে এরা মঙ্গোলীয় হলেও এদের মধ্যে অস্টো-এশিয়াটিকের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ভাষা বিচারে এরা বৃহত্তর বোড়ো ভাষা গোত্রভুক্ত হলেও বর্তমানে তা লুপ্ত হয়ে সেখানে বঙ্গকামরূপি> কামরূপি মিশ্রণ ঘটেছে ব্যাপক ভাবে। ফলে এ ভাষার আদিরূপ সম্পর্কে এখন জানা যায় না। যেহেতু তাদের ভাষায় কোন লিপি ছিল না সে কারণে সাহিত্য-নিদর্শন বা কোন প্রমানাদি নেই। 'বোড়ো ভাষার উৎস জাত শব্দাবলি ও বোড়ো ভাষার অপভ্রংশ শব্দ পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশিরা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, রংপুর, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় বাস করে। ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এদেরকে আদিবাসী রূপে পৃথক করে গণনা করা হয় না। তাই বাংলাদেশে এদের সঠিক জনসংখ্যা বিষয়ে কোন ধারণা নেই। সবমিলিয়ে ২০ হাজার বা তার বেশি হবে।

২.খ কুকি-চীন শাখা : এই শাখার ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে মৈতেয় মনিপুরি, লুসাই, বম, খেয়াং, খুমি, ম্রো, পাংখো ইত্যাদি।

মৈতেয় বা মণিপুরি : মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তিব্বত-বর্মি শাখার কুকি-চীন গোত্রভুক্ত জাতি হচ্ছে মনিপুরি। বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মণিপুরি জাতির বসবাস। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং ঢাকায় এক সময় তাদের বসতি থাকলেও বর্তমানে নেই বললেই চলে।১৯৯১ সালের গণনায় দেখা যায় বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ২৪,৯০২ এবং ভারতে ১২৭,০২১৬ জন। বার্মাতেও এদের বসবাস রয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে মণিপুরী জাতি দুই ভাগে বিভক্ত। মৈতেয় মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। মৈতেয় মণিপুরিদের ভাষা হল মৈতেয় পুরনো একটি ভাষা। অন্য দিকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয় পরিবারভুক্ত বাংলা ও অহমিয়া ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। এই ভাষাভাষীরা তাদের ভাষা প্রাচীন দাবী করলেও এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই (www.ethnologic.com)। পূর্বে মণিপুরি ভাষার নিজস্ব হরফ ছিল। অধিকাংশের মতে, মৈতেয় লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত।

ভারতের মণিপুর রাজ্যে এই লিপির প্রথম প্রচলন হয় মহারাজ পাংখংবা-র (৩৩-১৫৪ খ্রি.) আমলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা গরীবে নেওয়াজ-এর সময়ে বৈষ্ণবধর্ম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর থেকে মৈতেয় মণিপুরি ভাষা বাংলা লিপিতেই নিয়মিতভাবে লিখিত হয়ে আসছে। মণিপুরি লিপির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এগুলি মানুষের একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নামানুযায়ী। যেমন – বাংলা 'ক' এর মণিপুরি প্রতিবর্ণ কোক, যার অর্থ মাথা, আবার বাংলা 'স'-এর মনিপুর প্রতিবর্ণ হচ্ছে 'সম' যার অর্থ চুল। ভারতের মনিপুর রাজ্যের বাক-ভাষা হিসেবে মনিপুরি সরকারিভাবে স্বীকৃত।

খুমি ভাষা: খুমিরা প্রধানত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় এবং মায়ানমারের আরাকান পার্বত্য অঞ্চল, চিন রাজ্য ও পশ্চিম মায়ানমারে বসবাস করে। বেশ কতগুলি বিশেষ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় হতে খুমিদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়। নৃতাত্ত্বিকভাবে খুমিরা আদি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা হয়। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্যান্য জাতিসমূহের মত খুমিদেরও রয়েছে ফর্সা ত্বক, লম্বা-সরু কালো চুল, চওড়া ও চ্যাপ্টা নাক এবং মুখোমন্ডল, ছোট চোখ সর্বপরি খুব মোটা ও শক্ত পায়ের গোড়ালি। খুমি তিব্বত-বর্মি ভাষা পরিবারভূক্ত একটি ভাষা এবং তাদের ভাষায় নিজস্ব কোন লিপি নেই। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এলেও বলা যায়, খুমিরা তাদের আদি ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি, পার্থক্যসূচক ভাষিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ক্রম হ্রাসমান জনগোষ্ঠীর কারণে বর্তমানে খুমি ভাষা বিলুপ্তির পথে। গত দেড়শত বছরে বাংলাদেশে খুমি জনসংখ্যা অনেক কমে গেছে। এর ফলে খুমি ভাষা বিপন্ন প্রায় (endangered)। ১৯৯১ সালের বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত জনগণনায় দেখা যায় এদের সংখ্যা ১২৮১ জন।

ম্রো ভাষা : বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ম্রো আদিবাসী দীর্ঘ দিন যাবত বসবাস করে আসছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি মতে, এই আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ২২১৭৮ জন। যদিও কারো কারো মতে এই সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার মত । ম্রোরা পার্বত্য চট্টগ্রামের শুধুমাত্র বান্দরবান জেলাতেই বসবাস করে। বান্দরবানের লামা, আলিকদম, থানছি, নাইখ্যাংছড়ি ও রুমা এলাকার প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে এদের বাস। বাংলাদেশের বাইরে মায়ানমারের আকিয়াব জেলায়ও (সিত্তুই) এরা বসবাস করে। এথনোলগ রিপোর্টে দেখা যায় সেখানে তাদের সংখ্যা ২০,০০০ মতো। সব মিলিয়ে বার্মাও বাংলাদেশে ৪০ হাজার ম্রো বাস করে । ধর্ম বিশ্বাসে প্রকৃতি পূজারী হলেও এদের কেউ কেউ খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। 'তবে বর্তমানে নতুন ধর্ম "ক্রামা ধর্মে বিশ্বাসী অনেকেই। মেনলে ম্রো ক্রামা ধর্ম এবং ম্রো বর্ণমালার প্রবর্তক। ম্রোরা নিজেদেরকে বলে 'মারুসা'। যদিও পার্বত্য অঞ্চলে তারা মুরং নামে পরিচিত। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে। আরাকানী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা ত্রিপুরাদেরকেই ম্রং বলে। জনসংখ্যা এবং ভাষা বিচারে ম্রোরা সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যা লঘু হওয়ায় এদের অধিকাংশই বহুভাষী। মাতৃভাষা ছাড়াও তারা বাংলা এবং মারমা জানে। জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর LSI-এ- ম্রো ভাষাকে বর্মী দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পাংখোয়া : বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে বলা যায় বিপন্ন রয়েছে যে কটি আদিবাসী তাদের মধ্যে পাংখোয়া অন্যতম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি মতে এদের সংখ্যা ৩২২৭ জন। ভারতের মিজোরামেও কিছু সংখ্যক পাংখোয়া বাস করে। পাংখোয়ারা মূলত রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি এলাকায় বসবাস করে। হাচিসন এদের ২টি গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন – ১) পাংখোয়া ও ২) ডনজাঙ। অতীতের কোন এক সময় তারা মিজোরামের পাংখোয়া নামক গ্রাম থেকে এ পার্বত্য অঞ্চলে এসেছিল। লুসাইদের সঙ্গে এদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। চীনা-তিববতী ভাষা পরিবারের কুকি-চীন-নাগা শাখাভুক্ত পাংখোয়া ভাষায় নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। রোমান হরফ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে বিভিন্ন চিঠিপত্রে। এক সময়ে প্রকৃতির পূজারী হলে ও বর্তমানে এরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত শুধু ভাষাটি বলা যায় টিকে আছে বিপন্ন অবস্থায়।

লুসাই: লুসাই মূলত চীনা-তিববতি ভাষা-পরিবারভুক্ত একটি ভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরের লুসাই পাহাড় থেকে তারা এ অঞ্চলে আসে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লুসাইরা বাংলাদেশে সংখ্যায় খুবই কম। ১৯৯১ সালের হিসাবে দেখা যায় এদের সংখ্যা ৬৬২ জন। লুসাইদের অন্য নাম হচ্ছে মিজো, লুসেই, হুয়ালাংগো ইত্যাদি। মায়ানমার এবং ভারতে এদের সংখ্যা যথাক্রমে ১২৫০০ এবং ৫,৩৮,৮৪২ জন। এরা রাঙ্গামাটির বাঘাই ছড়ি বরকল সীমান্তবর্তী এলাকায় বাস করে। এখানে লুসাইরা সংখ্যায় কম হলেও অন্যান্য কুকি-চীনভাষী লোকদের মধ্যে বম এবং পাংখোয়ারা লুসাইদের ভাষা বুঝতে পারে এরা প্রত্যেকেই রোমান ২৫টি হরফ নির্ধারণ করেছে তাদের ভাষায় ব্যবহারের জন্য।

বম : পার্বত্য চট্টগ্রমের বান্দরবান জেলাই প্রধানত বমরা বাস করে। এছাড়া রাঙ্গামাটির বিলাই ছড়িতেও এদের কিছু পরিবার আছে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারিতে এদের জনসংখ্যা ৬৯৭৮ জন। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে এদের জনসংখ্যা ৩৫৮১ জন (২০০০)। সেখানে ফালাম এলাকা ও চীনা পাহাড়ে এদের বাস। বমদেরকে বম, বন, বাউন, বোনজোগি, বঙ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। এদের ভাষা মূলত চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারের কুকি-চিন-নাগা শাখাভুক্ত। ধারণা করা হয় যে, এক সময় চীনের মূল ভূখণ্ডের চিনলুং পতিমালা এলাকায় এই উপজাতি বসবাস করতেন। পরবর্তী কালে বার্মার চেনদুইন ও ইবাবতী নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করেছিলেন। শানদের ইতিহাসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বোমরা 'লাই' শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী বমরা

নিজেদেরকে 'লাই' বা 'লাইমি' বলে যার অর্থ হচ্ছে- মানুষ। এদের প্রধান দুটি গোত্র হচ্ছে- শুনথলা ও পাংহয়। কৃষিজীবি বমরা অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করেছে। বর্তমানে বমরা ২৫টি রোমান হরফ ব্যবহার করছে তাদের ভাষায়।

২.গ সাক-লুইশ শাখা

চাক ভাষা :

চাকরা বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় বাস করে। এছাড়াও মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যেও তারা বাস করে। সেখানে তাদের আরেক নাম হচ্ছে সাক (Sak) বা থাক (thak)। মায়ানমারে তাদের সংখ্যা ২০ হাজার (এথনোলগ; ২০০৫) আর বাংলাদেশে চাকদের সংখ্যা ২০০০ (BBS, 2002)। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বাইশারি, নাক্ষ্যংছড়ি, আলিখ্যং, কামিছড়া, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষ্যং প্রভৃতি জায়গাতে বাস করে। নামগত সাদৃশ্য ছাড়া চাকমাদের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। চাকদের ভাষা চীনা-তিব্বতি পরিবারের। চাক বা আসাক (Asak) ভাষার সাথে উত্তর বার্মার মিটকিনা, কাথা এবং চেনদুইন অঞ্চলের কাডু (Kadu), গানান (Ganan) জনগোষ্ঠীর ভাষার মিল পাওয়া যায়। জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে মনিপুরের আন্দো, সেংমাই এবং বাইরেল উপভাষার সঙ্গে চাক ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। চাক ভাষার কোন বর্ণমালা নেই।

ঠার/থেক বা ঠেট ভাষা : বর্তমানে বাংলাদেশে ঠার বা থেক বা ঠেট ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪০০০০। ১৬৩৮ সালে শরণার্থী আরাকানরাজ বলালরাজার সাথে মনতং (Mon-Tong) জাতির যে ক্ষুদ্র অংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করে তাদের ভাষার নাম ঠার বা ঠেট বা থেক ভাষা। লোকচিকিৎসা (ethno-medical) পেশার সাথে সম্পৃক্ততার ফলে কালক্রমে এরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাইদ্যা বা বেদে নামে পরিচিতি লাভ করে। এই মনতং বা বেদের নিজ জাতির লোকদের মধ্যে ঠার ভাষা ব্যবহার করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। ঠার ভাষা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। ঠার ভাষা-র নিজস্ব কোন বর্ণমালা না থাকলেও মৌখিক সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। ঠার বা থেক বা ঠেট ভাষা-র বার্মা, চীন, লাওসে প্রচলিত কাডু ভাষার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

২.গ. বার্মিজ শাখা

২. **রাখাইন ভাষা:** পটুয়াখালী, কক্সবাজার, বরগুনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সতের হাজার লোক রাখাইন ভাষায় কথা বলে। পটুয়াখালী কক্সবাজার ছাড়াও মহেশখালিসহ কিছু কিছু পার্বত্য অঞ্চলে (বান্দরবান, রাঙামাটি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাখাইনরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ব্যাপারে রক্ষণশীল জাতি। তারা নিজেদেরকে রাখ্যাইন>রাখাইন বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। রাখাইন ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একটি ভাষা এটি মুলত মারমা ভাষার উপভাষা। জানা যায় খ্রিষ্ট পূর্ব ৩৩২৫ সাল হতে রাখাইন রাজা মারায়ু কর্তৃক রাখাইন প্রে বা রাখাইন রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রাখাইন ভাষা ছিল ঐ রাজ্যের একমাত্র জাতীয় ভাষা। রাখাইনদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। রাখাইন বর্ণমালায় স্বরবর্ণ বা ছারা হল ১২টি এবং ব্যাঞ্জনবর্ণ বা ব্যোঃ মোট ৩৩টি। আদম শুমারি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় বাংলাদেশে রাখাইনদের সংখ্যা ১৬৯৩২ জন। 'পটুয়াখালীর রাখাইনরা মঙ্গোলীয় মহানৃগোষ্ঠীভুক্ত এক ক্ষুদ্র জনসমাজ। মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে তিব্বত, মায়ানমার (বার্মা), ইন্দোনেশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায়ও শাখার বিস্তার করেছে মঙ্গোলীয়রা'। (মুস্তাফা মজিদ; ১৯৯২: ৬৫) মারমা, রাখাইন এবং ম্যা মূলত একই ভাষিক গোত্রের বিভিন্ন উপ-ভাষাভাষী আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. ভাষা পরিবার: দ্রাবিড়

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের এক বিশাল ভাষা পরিবার হচ্ছে দ্রাবিড় পরিবার। আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই এই দ্রাবিড় ভাষাসমূহ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ভাষাসমূহের মধ্যে ওঁরাওদের কুঁড়ুখ উল্লেখযোগ্য। যদিও পাহাড়িয়া, মালতো প্রভৃতি জাতির মধ্যে এক সময়ে দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে তারা সাদরি ব্যবহার করে।

ওরাঁও বা কুঁড়ুখ ভাষা : বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাতেই এক সময় ওঁরাও বা কুঁড়ুখ ভাষা-ভাষীদের বসবাস থাকলেও বর্তমানে শুধুমাত্র রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট জেলাতে কুড়ুখ ভাষী ওরাঁওগণ বাস করে। এছাড়াও সিলেটের চা বাগানে অল্প কিছু ওরাঁও বাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশ এদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। কুঁড়ুখ ভাষাটি আদি ও কথ্য ভাষা। এই ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ওরাঁওরাই দ্রাবিড়িয় ভাষা বংশের সদস্য। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও এদেরকে দ্রাবিড় বা প্রাক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। এদের চেহারা কালো, নাক খাঁড়া ও চ্যাপ্টা, চুল কোঁকড়ানো, মাথা গোলাকৃতি এবং উচচতা মাঝারি হওয়াই এরা মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের (Mongoloid) মধ্যে পড়ে না।

পাহাড়িয়া ভাষা : বাংলাদেশের রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৭৩৬১ জন পাহাড়িয়া জাতির লোক বাস করে। পাহাড়িয়া জাতির দুটি শাখা রয়েছে। এদের একটি শাওরিয়া পাহাড়িয়া বা মালের এবং অন্যটি মাল পাহাড়িয়া বা মালো। বাংলাদেশে মাল পাহাড়িয়াদের সংখ্যা কম। এদের ভাষাকে মালতো বলা হলেও আসলে মিশ্র ভাষা এবং দীর্ঘদিন বাঙালিদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে মূল ভাষা হারিয়ে গেছে। শাওরিয়া পাহাড়িয়াদের ভাষা বর্তমানে সাদরি-র খুব নিকটবর্তী এমনকী সাদরি নামে বহুল পরিচিত। শাওরিয়া ও মাল পাহাড়িয়াদের ভাষার কোন নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

মাহালি ভাষা: উত্তরবঙ্গের মাহালি জাতিগোষ্ঠীর ভাষার নাম মাহালি ভাষা হলেও এই ভাষার বর্তমান রূপকে সাদরিই বলা হয়। সম্ভবত মূল রূপটি বিলুপ্ত হয়েছে যা দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ছিল। এদের কথ্য ভাষায় মূল বর্তমানে শুধু মাহালি ভাষার কিছু কিছু শব্দাবলীর প্রচলন লক্ষ করা যায়।

ভাষার পরিবার: ইন্দো-ইউরোপীয়

ধারণা করা হয় নর্ডিক এবং আলপিনি নামের দুই ভিন্ন নরগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আর্য ভাষার প্রবর্তন করেছিল। নর্ডিক-দের রচিত ঋগ্বেদের ভাষাই আর্য ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। ঋগ্বেদের ভাষা তথা বৈদিক ভাষা পরিবর্তিতে ব্যাকরণবিদদের হাত ধরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং নানা নিয়ম সূত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে এ ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হয়। আর এরই একটি রূপ। কালক্রমে লোক মুখে বিকৃত হতে হতে প্রাকৃত ভাষার রূপ নেয়। এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই অপভ্রংশ হয়ে নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি। বাংলাদেশে ইন্দো-আর্য (Indo-Arayn) ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষার মধ্যে বাংলা উল্লেখযোগ্য হলেও আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা ভাষা এবং সাদরি ভাষা এই গোত্রভুক্ত ভাষা। এছাড়া মণিপুরিদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া, হাজং প্রভৃতি এই বর্গের ভাষা। কয়েকটি ভাষার পরিচয় উদ্ধৃত হলো।

চাকমা ভাষা : বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যা এবং অবস্থান বিচারে চাকমা বা চাঙমা অন্যতম। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশেও বাস করে। এছাড়া চাকমাদের একটি শাখা মায়ানমারে রয়েছে বলে জানা যায়, যেখানে তারা মূলত দইংনাক (Doingnak) নামে পরিচিত। চাকমারা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয়। চাকমা ভাষা ই-ই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী একমাত্র চাকমা এবং তঞ্চঙ্গাদের ভাষা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বা তার আশেপাশে ভারত ও মায়ানমার-এ বসবাসরত প্রায় সকল মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জাতিসত্তার ভাষা ভোটচিনীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই এদিক থেকে চাকমাদের সাথে অন্যান্য প্রায় সকল আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর অমিল লক্ষ করা যায়।

প্রায় সকল ভাষাতাত্ত্বিকই চাকমা ভাষাকে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসন চাকমা ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচ্য শাখার দক্ষিণ-পূর্বী উপশাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাদরি : বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে সাদরি ভাষা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত। এ অঞ্চলে বসবাসকারী দুই প্রধান আদিবাসী জাতি হচ্ছে সাঁওতাল ও ওরাঁও। সাঁওতালদের মধ্যে কেউ কেউ সাদরি ভাষায় ভাব আদান-প্রদানে অভ্যস্ত। তবে ওরাঁওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদরি ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলাগুলোতে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসীদের প্রধান ভাষা হচ্ছে সাদরি। বাংলাদেশে সাদরি ভাষা আদিবাসীদের সংখ্যা কত এ বিষয়ে তেমন কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। এক তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ সাদরি ভাষী রয়েছে (web; 2005)। সাদরি ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো-আর্য, পূর্বাঞ্চলী, বিহারি শাখাভুক্ত ভাষা। শুরুতে ব্যবসায়িক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ক্রমে ক্রমে এই বিশাল আদিবাসী গোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ছোট-নাগপুর, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, প্রভৃতি রাজ্যের এক বিরাট জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসেবে সাদরি বহুল ব্যবহৃত। বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ৮৫ হাজার ওরাঁওদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা সাদরি। এদের মূলভাষা কুঁড়ুখ এরা জানেনা বিশেষ করে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ জেলায় বসবাসকারী ওরাঁওগণ। মাহাতো, সিং, রাজোয়াড়, মাহালি, কর্মকার, রবিদাস, কুলকামার, পাহান, রাই, তুরি, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীগণ সাদরি ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা: বাংলাদেশের মূলত সিলেট বিভাগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের বসবাস। জাতিগতভাবে এক হলেও মণিপুরি জাতি ভাষাগতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরি ভাষার দুটি উপভাষা রয়েছে– একটি রাজার গাঙ (অর্থাৎ রাজার গ্রাম) এবং অপরটি মাদাই গাঙ (অর্থাৎ রাণীর গ্রাম)। ড. কে পি সিনহা-র মতে নব ইন্দো-আর্য ভাষার উৎপত্তি কালে বা সামান্য পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে ইন্দো-আর্য ভাষার থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র্য ভাষা হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা সর্বপ্রথম ভারতের মণিপুর রাজ্যে প্রচলিত হয়। পরে এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ষোড়শ শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতেয় জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াতে মৈতেয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় ব্যাপকভাবে ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের শব্দাবলি প্রবেশ করে। অহমিয়া ও বাংলা ভাষার সাথে এই ভাষার যথেষ্ট মিল থাকার কারণে এটিকে বাংলা বা অহমিয়ার উপভাষাও বলা হয়ে থাকে।

হাজং: ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষা পরিবারের মধ্যে হাজং ভাষা বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাংশের ময়মনসিংহ (বিরিশিরি, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, সুসং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ১২০০০ আদিবাসী হাজং ভাষা ব্যবহার করে), শেরপুর, নেত্রকোণা, জামালপুর এবং সুনামগঞ্জসহ সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ১৪ হাজার হাজং বাস করে (ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার; ১৯৯২; ৮৯)। নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় এরা মঙ্গলীয় জাতির হলেও এদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়। যদিও জীবনাচরণও অন্যান্য দিক থেকে গারো এবং কোচদের সঙ্গে মিল রয়েছে। জর্জ গ্রিয়ারসন (১৯২৭; ৬২) হাজং ভাষাকে তিব্বত-বর্মন ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ভাষা বাংলা এবং অহমিয়ার সঙ্গে এতটাই সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোন ক্রমেই এটাকে চীনা-তিব্বতী পরিবার ভুক্ত ভাষা বলার অবকাশ নেই। এমনকী কাছারের (আসাম) ভাষার অসংখ্য শব্দাবলি এই ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ধর্ম-পালনও পূজা-আচারের বিবেচনায় হাজংরা হিন্দুদের সমগোত্রীয়।

তঞ্চঙ্গা : বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে তঞ্চঙ্গা উল্লেখযোগ্য। এরা মূলত বাস করে রাঙামাটি এবং বান্দরবান জেলায়। ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা প্রভৃতি দিক থেকে তঞ্চঙ্গারা অনেকটা এগিয়ে আছে চাকমা এবং মারমাদের মতো। তঞ্চঙ্গাদের রয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা। যা মারমা বর্ণমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং চাকমা বর্ণমালার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। জাতিগতভাবে তঞ্চঙ্গারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক দাবি করলেও নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিচারে অনেকের মতেই তারা অভিন্ন চাকমা জাতির দুটি ভিন্ন গোত্র। শারীরিক গঠন, গায়ের রং, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কিছু সামান্য পার্থক্য ছাড়া মূলত অভিন্ন। (বিরাজমোহন দেওয়ান, মাধবচন্দ্র চাকমা, আব্দুস সাত্তার প্রমূখের মতে) ক্যাপ্টেন টি.এইচ. লুইন তার গ্রন্থে তঞ্চঙ্গাদেরকে চাকমা জাতির একটি উপগোত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন ।

বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসীরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও তঞ্চঙ্গারা তাদের বৌদ্ধ ধর্মকে অক্ষুন্ন রেখেছে। 'চাকমা ভাষা এবং তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার মধ্যে উচচারণগত তারতম্যটাই মূল পার্থক্য, এর বেশী কিছু নয়। চাকমা ভাষা লিপি এবং তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা লিপি প্রায় এক, যার অধিকাংশই বর্মী হরফের অনুরূপ। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাভুক্ত একটি ভাষা'।

তথ্যনির্দেশ

এ কে শেরাম; ১৯৯৬। *বাংলাদেশের মণিপুরী: ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেনী সঙ্গম*; আগামী প্রকাশনী; ঢাকা ।

কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী; ১৯৮৯। *ককবোরক ভাষা ও সাহিত্য*। অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা।

মং বা অং; ২০০৩। *বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, প্রকাশক- লেখক।

মুহাম্মদ আব্দুল জলিল; ২০০১। *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী: লোকজীবন ও লোকসাহিত্য: ওঁরাও*; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

শিবানী রায় (মন্ডল); ২০০২। *আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা*; পুস্তক বিপনি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ১৯৯২। *ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা*; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; প্রাঃ লিঃ কলকাতা।

রসময় মোহান্ত; ১৯৯৮। *সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী প্রেক্ষিত ও সমাজ সমীক্ষা*; আত্ম উন্নয়ন সমিতি (আউস), কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার।

Bodding P.O. 1929. *Meterials for a Santali Grammar*, Dumka;

Burling, Robbins. 1983. *The Language of the Modhupur Mandi (Garo)*: Vol-I Grammar; Bibliophile south Asia; New Delhi, India.

Grierson. G.A. 1973. *Linguistic Survey of India*; Motilal Banarasidas; Delhi; R.P.

Qureshi, M.S. (ed.) 1984. *Tribal Culture in Bangladesh*; IBS, Rajshahi

Loffler, Lorenz; 1966. *The Contribution of Mru to Sino-Tibetan Linguistics*, Zeitschrift der deutschen morgenlandischen. Gesellschaft. Germany.

Website; 2005; *Languages of Bangladesh*; Ethnologe

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পটভূমি

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের সকল গৌরবের উৎস। একুশের চেতনায় আমাদের জাতিসত্তা পুষ্ট। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীনতা একুশের রক্তস্রোত সঞ্জাত। ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা যে ইতিহাস গড়েছি আজ তা দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বসভায় অভিষিক্ত, প্রতিষ্ঠিত।

অর্ধশতাব্দী ধরে প্রাণের আবেগ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা নিজেরাই একুশে ফ্রেব্রুয়ারি উদযাপন করছি। আজ তা সকল দেশের, সকল জাতির বিশেষ দিন। ১৯৯৯ এর ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০ তম সাধারণ সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। আর এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পেছনে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রেক্ষিতে জাতির উপর অর্পিত হয়েছে এক বিরাট দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সুচারুভাবে বহনের জন্য, এ বিরল সম্মান ও গৌরবকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেনঃ

ক) বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

খ) প্রস্তাবিত কেন্দ্রে বাংলাভাষাসহ বিশ্বের গুরুত্বপর্ণ ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষসাধনের জন্য গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হবে।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প' হাতে নেন যার বিবরণ নিম্নরূপ :

• প্রকল্পের নাম	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প
• উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন সংস্থা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
• প্রকল্প দলিল (পিপি) অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল	প্রারম্ভ–জানুয়ারি ২০০০, সমাপ্তি-জুন : ২০১০
• মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	১৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা
• অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
• একনেক সভাকর্তৃক প্রকল্প সারপত্র (পিসিপি) অনুমোদন	৮ আগস্ট ২০০০
• প্রকল্প দলিলের প্রশাসনিক অনুমোদন	১৯ জুন ২০০১

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. মাতৃভাষা বাংলাকে সমুন্নত রাখার সংগ্রামদীপ্ত মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করায় বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ, ও সমন্বয় সাধন করা;

২. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, বর্ণমালা, প্রকাশিত বই, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং তথ্য বিনিময় করা;

৩. কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে জাদুঘরের মতো আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা এবং ইন্টারনেট ওয়েবসাইট খোলা;

৪. সভ্যতার বিকাশে বিলুপ্ত হয়েছে এমন ভাষাসমূহের তথ্যাদি পাওয়া গেলে তা সংরক্ষণ করা;

৫. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত-রচনাবলী বাংলা থেকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৬. যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়োজনে সুদক্ষ দোভাষী তৈরি করা এবং কোন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতাকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য ভাষায় অনুবাদের প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যবস্থা করা;

৭. ভাষানীতি প্রণয়ণে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;

৮. ভাষাশিক্ষা ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও কৃষ্টিকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;

৯. বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ওপর গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;

১০. ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান।

অর্জিত অগ্রগতি

১৯৯৬ - ২০০১ সময়কালের আওয়ামী লীগ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিজ্ঞ এবং সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর তিনি ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টনের উৎসব সমাবেশে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন। ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ঢাকার সেগুন বাগিচায় ১.০৩ একর ভূমির ব্যবস্থা করেন। গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ এ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মূল ভবনের স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্শা সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সমাপ্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। বিএনপি-জামাতের জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। দীর্ঘদিন প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সংশোধিত প্রকল্প প্রণয়ন করে অডিটোরিয়ামসহ ভবনের তিনতলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১২তলা পর্যন্ত ভবন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হবে। একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১০-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ওয়েব সাইট উন্নয়নের প্রস্তুতি চলছে। অন্যান্য পরিকল্পিত কাজও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। সকল প্রকার জটিলতা উপেক্ষা করে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব তিনি 'ইউনেস্কো'তে পাঠানের ব্যবস্থা নেন। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক এবং ইউনেস্কো 'শান্তি পুরস্কার' গ্রহণের জন্য প্যারিস সফরকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলেন। সরকারি প্রস্তাবটি 'ইউনেস্কোতে' বিবেচনার জন্য তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এইচ এসকে সাদেক এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন, এই প্রতিনিধি দলকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর সকল বাধা অতিক্রম করে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

International
Mother Language Institute Project

Dhaka, Bangladesh

Background of the Project

Of the total world population, 4% speak Bangla. When Pakistan was born in 1947, 53% of its population spoke Bangla. But in 1948 the then Govt. of Pakistan tried to introduce Urdu as the state language of Pakistan denying linguistic rights of the majority. The people of the then East Pakistan started protests and agitations against this evil design of the Govt. About 5 years' accumulated grief and grudge of the Bangalees, the movement reached its culmination on the Twenty First February of 1952; on which day on orders of the Pakistani rulers, police fired on a peaceful procession of people comprising of students and common men. Salam, Rafique, Barkat, Jabbar and many more embraced martyrdom. Many students, teachers, labourers, artists and general public were arrested and tortured by police.

The language movement is the result of the uncompromising determination, sacrifice, dedication and spirit of the struggle of the people of the then East-Pakistan. People's rights were achieved as a result of unflinching attitude of not bowing down to the innumerable torture of the repressors. At long last, Bangla was given recognition as one of the state languages. And this victory was achieved by students, teachers, labourers-cultivators all sections of Bengali speaking people. The struggle the Bangalees waged and the sacrifice they made to establish Bangla as a state language is never to be seen anywhere in the world. To keep the prestige of mother language so exalted, no nation had to fight so hard and make such sacrifices. With the independence of Bangladesh in 1971 through a great war of liberation, Bangla got its due national status and state recognition. Since independence, various initiatives have been taken by the Govt. to raise Bangla language to its excellence. Very few developing countries of the world have been using their mother languages in all spheres of life as is the case with Bangla. Bangla is not only the state language; its use in Govt. offices and educational institutions is also compulsory. The Twenty First February is thus very significant to the Bangalees. Every year in the month of February a series of programmes including 'National Book Fair' are organized and observed throughout the country.

The struggle the Bangalees waged to uphold the exalted position of Bangla, attracted the attention of the international community. A Canada-based NGO "Mother Language Lovers of the World" and expatriate Bangalee community first submitted a proposal to declare the Twenty First February (the day, the Bangalees made supreme sacrifice for state language status of Bangla) as the "International Mother Language Day" to the UNESCO. The UNESCO in its turn opined that such a proposal could be considered if it is sent by a National Commission member state of the UNESCO.The then Awami League government under the auspicious leadership of Sheikh Hasina immediately took the initiative to send a government proposal. Under her instruction Bangladesh Government formally sent the proposal to the UNESCO on 09 Sept 1999. It was a long process. Honourable Prime Minister Sheikh Hasina took pionering role in the initiative of UNESCO's declaration of 21st February as the International Mother Language Day. She sent a 7 member group of representatives led by the then Education Minister A. S. H. K. Sadeq, and provided appropriate

apropos guidance and supervision. The Honourable Prime Minister's brave and timely steps will be etched in gold in the history of the Bengali language.

The team of representatives sent by the Honourable Prime Minister as well the then permanent representative at the UNESCO head quarters Syed Moazzem Ali were able to achieve success with the strength of their merit and experience. The role of the multilingual and multiethnic community of Canada in the intiative to declare the International Mother Language Day was invaluable. I extend my heartiest felicitations to this community including Rafiqul Islam, Absus Salam and the 10 member team comprising members from seven races and seven languages and everyone involved therein. As the chair of the then Parliamentary Standing committee on the Ministry of Education I had the good fortune of being involved in this historical effort. For this I feel very fortunate.

The Bangladesh proposal was sent for consideration to the Commission II by the Language Division of the UNESCO. As a result of the untiring efforts and ceaseless activities of the group of Bangladesh representatives, Commission II of the UNESCO on 16 November, 1999 passed the proposal and placed it before the General Assembly. On 17 November, 1999 the UNESCO on consensus of all member-states declared Twenty First February as the International Mother Language Day; and made it mandatory for the UNESCO HQs as well as for all member-states to observe the day. The UNESCO's declaration brought rare honor for Bangladesh. Bangalee nation, people of Bangladesh and for the Bangla language.

A country occupying a very small space on the world map was bestowed such unprecedented deferential treatment. The Bangalee nation remembers with deep gratitude and pride the story of their ancestors' great struggle and sacrifice "Ekushe February" the pride of Bangladesh and its international recognition has proved once again that the struggle to achieve something great remains through ages unforgettable. The UNESCO's declaration of Twenty First February as International Mother Language Day has entrusted a lot of responsibilities on Bangladesh and the Bangalees. Upholding and making this rare honour more prestigious is keenly felt by all quarters.

Immediately after UNESCO's recognition of Twenty First February as International mother Language Day, the Govt. of Bangladesh announced the following steps to be taken by the Govt.

a. Bangladesh will establish an International Mother Language Research Centre.

b. This Center will provide all facilities for training in all important languages; all the languages will be stored and research work will be conducted for attaining excellence of languages.

01. Name of the Project	:	**Revised :**	International Mother Language Institute Project (IMLIP).
		Duration:	January 2000 to June 2010.
		Original :	Establishment of International Mother Language Institute Project.
02. Location of the Project	:	Dhaka, Bangladesh.	
03. a) Objective of the Project	:	Establishment of proposed International Mother Language Institute and implementation of the main objectives of the institute in limited scale.	
b) The main objectives of the Institute are	:		

1. In recognition of the exalted position of the great Twenty First February as "Internation Mother Language Day" by the UNESCO, the Institute will conduct research to develop, preserv and harmonize all languages of the world including Bangla;

2. To collect, preserve, analyse, review and exchange informations regarding various moth languages, alphabet, published books, cassettes, videos and CDs etc;

3. To collect latest information of all the mother languages of the world through computer ar internet and to preserve those in a modern system as is done by museums and to open websi on the internet;

4. To preserve, if available, information regarding languages that are now extinct (with tl evolution of civilization);

5. To undertake works of translating the writings on science, knowledge and technology into oth languages from Bangla and vice-versa;

6. To develop expertise, through appropriate training, for instant interpretation of lectures fro any language to meet Govt. and non-Govt. requirements

7. To help the Govt. to prepare a Language Policy;

8. To induce people to learn various languages of the world by organizing cultural functions of different countries;

9. To establish linkage with different universities and to invite language specialists of different countries to undertake research works on languages including Bangla;

10. 'Awards of Honour' for distinction in the field of language & literature;

Activities

Introduction: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recognized and declared the Twentyfirst February as the International Mother Language Day on 19 November 1999. So it is indispensable to adopt institutional measures for conducting researches on various languages including Bengali, one of the mother languages of the world. With this in view, decision has been taken to establish an International Mother Language Institute. The following are the functions chalked out for the Institute:

1. To conduct researches on similarities and differences between Bengali and various other languages of the world (that is, to conduct researches on the relationship between Bengali and Sanskrit, between Persia and Bengali and between Bengali and such other languages).

2. a. To conduct researches on the excellence of Indo-Aryan languages and on their inter-relationship.

2. b. To conduct researches on the aspects of changes of the Bengali language during the period ranging from the old Indo-Aryan period till today.

3. To study and undertake researches on the traits of dialects in Bangladesh.

4. To arrange to collect data of and conduct researches on the dialects of Bangladesh (e. g. the dialects of Chittagong, Sylhet, Rangpur, Dhaka and so on) and to prepare an atlas of dialects.

5. To collect and publish the folk-literature, folk-arts, music, stories, folk-tales and proverbs and sayings of various dialects in Bangladesh.

6. To publish at least two six-monthly or yearly research journals -- one in Bengali and the other in English. Those two journals shall contain articles on various linguistic aspects of Bengali and other mother languages.

7. To generate scopes for researches on old and medieval Bengali hand-written manuscripts to be collected from various countries and regions. Manuscripts on Bengali written in other languages will also be included into it.

8. 1. To collect samples of ethnic minority languages in Bangladesh such as Chakma, Marma, Murang, Santal, Tripura, Garo, Hajong, Monipuri, Onrao, etc., and to make necessary survey into them, and to publish researches undertaken on the traits and nature of those findings.

8. 2. To find out the causes of disappearance of the primitive tribe called 'Munda' from Bangladesh and to discover affinities and differences between Bengali and Munda (On this context, to find out history of languages of Munda and Onrao tribes).

9. a. To collect researches so far done on stone and copper inscriptions of ancient Bengal, particularly during Murya, Gupta, Pala and Sena periods and to make arrangements, if necessary, to publish them through re-deciphering, analysis and evaluation.

9. b. To hold discussion on the traits of the arts called 'Bengal Art' of Murya, Gupta and Pala periods.

10. To conduct researches on the changes of Bengali scripts (In this respect, mention may be made to the Nagri scripts of Sylhet, to the writing of Bengali in Arabic or any other scripts in Chittagong and various other regions).

11. To collect information about languages by using available modern information technologies like internet, website, etc.

12. 1. To set up resource centres, learning centres and model language laboratories in order to offer courses and training on different languages.

12.2. To make arrangements to offer short courses, especially on English and Arabic for those willing to go abroad on job purposes and to introduce courses on the languages of other countries including Malaysia, Japan, Taiwan and Korea. If necessary, more new courses on languages may be introduced.

3. To make arrangements to introduce courses and training on applied linguistics.

4. To offer a six or three month training to different groups consisting of ten or fifteen persons each in order to collect dialects, to write, analyse and compile them into a standard language.

13. To find out and preserve the world languages that have disappeared and about to disappear.

14. To make arrangements, if necessary, to graphise those languages which have no alphabet of their own. To use International Phonetic Alphabet (IPA) for the purpose. Additional signs may be used, if needed.

15. To review the methods undertaken in different countries of the world for studying, developing and promoting mother languages and to ascertain whether those methods are applicable for the Bengali language.

16. To set up a link with the language institutes of different countries including Bangladesh or other international organizations.

16.1. To establish a link between International Mother Language Institute and different projects of the United Nations. To maintain communication with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and such other organizations of the world.

16.2. To establish a link with the oriental institutes, departments or faculties at different universities of the world (In this respect, a link may be established with the School of Oriental and African Studies of London University, the departments of Persia, Urdu and Bengali at Charles University in Checkoslovakia and with the Department of Asian Studies at Chicago University in America). As Indian Government has made grants to some of the universities of America for different research projects, there are also similar projects financed by the Pakistan government. To take steps to discover them properly and maintain communication with them for receiving grants from them.

17. The departments of International Mother Language Institute through which its activities will be executed are as follows: (1) the Department of Bengali Language — researches on the Bengali language will be undertaken in this department and arrangements shall be made to produce and publish particularly a complete grammar of modern Bengali; (2) the Department of Comparative Study of Languages — this department will cover comparative studies on Bengali, Sanskrit, Pali, Persia and occidental languages; (3) the Department of Dialects—under this department data will be collected from various dialects and those data will be analysed linguistically; (4) the Department of Publication—this department will arrange to publish journals, booklets and researches; (5) the Department of Information Technology—this department will deal with Internet-Website; (6) the Department of Cultural Affairs—under this department, various meetings, seminars, symposia, workshops and discussion meetings will be held, and special researches will been conducted and seminars will be organized in collaboration with the Bengali research centres in different countries and with the departments of Bengali, museum and archives in the universities throughout the world; (7) the Department of Planning and Training—the functions of this department are (a) to gather research materials of Bengali and other languages from different countries of the world and to invite the orientalists of different countries; (b) to make plans for future and accordingly organize training at home and abroad and to make arrangements for exchanging trainers, (c) to organize training locally in accordance with the rules as prescribed in this manual; (8) the Department of Library— the functions of this department will be (a) to collect all the works done so far on languages from those countries of the world where such researches have been undertaken; if needed, to collect the xerox-copies of the books from different libraries of the world; (b) to preserve the copies of the latest publications related to the activities of the Institute and the reference journals, magazines, books published previously; (9) the Department of Museum and Archives — this department will collect and preserve in different media information about researches on languages in different countries, audio, video cassettes and CD, etc.; (10) the Department of Archaeology — this department will conduct comprehensive researches on ancient stone inscriptions, plaques, copper inscriptions, coin inscriptions, hand-written manuscripts and other archaeological inscriptions in Bengali and other relevant languages; (11) Administrative and Common Service Department; (12) Department of Finance, Accounts and Audit. The Institute may, if necessary, create more new departments.

18. International Mother Language Institute will arrange to offer memberships and fellowships to various linguists and other intellectuals of the world.

19. To offer gold medals from International Mother Language Institute to two nationals (at least one person) and one foreign national as a recognition to their outstanding researches on languages.

20. International Mother Language Institute will organize a reception ceremony once a year. In this ceremony, those who will be awarded gold medals and those who will be offered honourable membership and fellowship from International Mother Language Institute will be felicitated. An internationally reputed scholar will be invited as a special guest to deliver a speech in this ceremony.

21. To extend cooperation to those persons and institutes who are engaged in studying mother languages and conducting researches on them.

22. There will be a very modern library in the International Mother Language Institute. There shall be arrangement in the library to preserve books and periodicals on languages, ancient and medieval manuscripts and other materials. Following the steps taken by the universities, museums, archives and the departments of archaeology at home and abroad, International Mother Language Institute shall adopt proper measures in this respect.

23. a. To make arrangements for offering scholarship for learning and teaching the languages of those small races (e. g. Chakma, Marma, Murang, Santal, Tripura, Garo, Hajong, Monipuri, Onrao and so on) who have no institutional arrangements for learning their own languages.

    b. To arrange fellowships for researches on these languages.

24. To arrange foreign aids by making contact with the Department of Economic Relation Division of Bangladesh, UNESCO and with other concerned organizations of the world.

25. This manual may, if necessary, be revised and updated from time to time.

26. The Bangladesh government as well as Bangladesh Bank shall provide foreign currency in those fields where it is needed for financial transaction and shall entrust the International Mother Language Institute with the authority in expending such money.

বাঙালি জাতির ইতিহাসের ঐতিহাসিক ছবি . . .

ভাষা আন্দোলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

শহীদ আবুল বরকত

শ্রদ্ধার্ঘ

আমার ভাইয়ের
রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি
ভুলিতে পারি?. . .

শহীদ জব্বার

শহীদ শফিউর রহমান

শহীদ আব্দুস সালাম

শহীদ রফিক উদ্দীন আহমেদ

২০০১ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীরা

৫২ এর মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে রাজধানীতে ছাত্র-জনতার মিছিল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত

মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি'র প্রদত্ত ভাষণ

আজকের এই ঐতিহাসিক মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু-কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা
মন্ত্রিপরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
মাননীয় সংসদ সদস্যগণ
Excellencies–The Ambassadors/High Commissioners,
Representatives of UN & UNESCO
and other international organizations,
কর্মকর্তাবৃন্দ
এবং শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ -
আসসালামু আলাইকুম।

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, আমাদের জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের অন্যতম মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামের এই দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের বীর শহীদদের। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ ভাষার জন্য যারা সংগ্রাম করে এই অধ্যায় রচনা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। অমর একুশের চেতনার এ পথ ধরেই আমাদের পরবর্তী সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন ত্যাগ ও সাফল্যের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার প্রতীক হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক সকল জাতির জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আমাদের মাতৃভাষার আন্দোলন বিশ্বজনীন মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে আরেক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। মহান ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের সংগ্রাম, ত্যাগ ও বিজয়ের প্রতীক এবং এর বিশ্বজনীন আবেদন এবং একই সংগে একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে বাঙালি জাতির প্রাণের আবেগ ও উচ্ছ্বাসই তাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙ্গালির মাতৃভাষা রক্ষায় সাহসী আত্মদানকে আমরা জাতীয় পরিসরে পরম শ্রদ্ধা, শোক ও গর্বের সাথে স্মরণ করে আসছি। 'ইউনেস্কো'র ঘোষণার মাধ্যমে মাতৃভাষাকে রক্ষা, লালন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের গভীরতম মানবিক চেতনাকে ধারণ করে জাতিসংঘ সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করার স্বীকৃতি দিয়েছে।

২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার উদ্যোগ সফল করার জন্য তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বাত্মক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে দেশ, জাতি ও জনগণের সুদুরপ্রসারী স্বার্থে সরকারি প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত এ এস এইচ কে সাদেক এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তৎকালীন রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীসহ প্রতিনিধিদল সেখানে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিকভাবে সম্মেলনের বিষয়টি তদারকি করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ বাংলা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভাষা আন্দোলনে আমাদের দু'জন শহীদের নামেই দু'জন তরুণ কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামসহ যারা প্রথম এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের ভূমিকাও আমাদের জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে উক্ত সম্মেলনে আমারও যাবার কথা ছিল। যেতে না পারলেও এ ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। এজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

সমগ্র পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ও বিকাশমান সকল মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকারের চেতনা সকল রাষ্ট্রে সমুন্নত হচ্ছে। আর এ বিশাল অনুপ্রেরণার মূল উৎস ধারায় পরিণত হয়েছে বাঙ্গালির মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম ও শহীদ দিবস। বাংলাদেশের মাতৃভাষা আন্দোলন আজ সারা পৃথিবীর সকল জাতির মাতৃভাষার অধিকারে রূপ লাভ করেছে। এটি বাংলাদেশের আপামর জনগণের অতি গর্বের বিষয়।

মাতৃভাষা বাংলাকে সমুন্নত রাখা ও সমৃদ্ধায়ন, বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির মাতৃভাষা চর্চা, গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধণের লক্ষ্যে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ১৫ মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন করেন। বিশ্বের সকল জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুধীমণ্ডলী,

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো- জাতির এ রকম গৌরবময় একটি বিষয়েও তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয়। নির্মাণ প্রকল্পে ১২ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল সাড়ে ১৯ কোটি টাকা। কিন্তু ৬ বছর পর নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বর্তমান ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করতেই ব্যয় হয়েছে সাড়ে ১৭ কোটি টাকা। জোট সরকারের দলীয় সংকীর্ণতা ও প্রতিহিংসার পরিণতিতে এরকম জাতীয় গৌরবের একটি প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে তার নমুনা এবং সময় ও অর্থ অপচয়ের একটি অনন্য নজির হয়ে থাকলো এই মহান প্রতিষ্ঠানটি। অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে প্রতিষ্ঠানটির আজ শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নবনির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলা ভাষাসহ বাংলাদেশের আদিবাসীদের মাতৃভাষাসমূহ এবং সারা বিশ্বের সকল মাতৃভাষার কল্যাণে কর্মমুখর রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমাদের প্রাণের ২১ শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কিত যাদুঘরে পরিণত করবো। বিশ্বের সকল ভাষার যাদুঘর স্থাপিত হবে এখানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ সকল বিষয়ে আপনি আগেই আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট বাংলা ভাষাসহ সারা বিশ্বের সকল মাতৃভাষা চর্চ্চা, উন্নয়ন ও গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হোক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হোক বিশ্বের সকল মানুষের ভাষা বিকাশের আশা-অকাঙ্খা, অভিব্যক্তি ও চেতনা বিকাশের অনুপ্রেরণাস্থল- এ আমার প্রত্যাশা।

সুধিবৃন্দ,

একুশের অন্তর্নিহিত চেতনায় রয়েছে আরও দু'টি মহৎ উপাদান, তা হ'ল- গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা। বাঙালির জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার সংগ্রাম সব সময়ই অবিচ্ছেদ্য।

সুধিমণ্ডলী,

বাহান্নর মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার যে বীজ অংকুরিত হয়েছিল তা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত যে লক্ষ্য, আদর্শ ও চেতনা আমাদের জাতির সকল সংগ্রামকে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর করেছে, আজ বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে তা বাস্তবায়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি ও পশ্চাদপদতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ব করে তা প্রয়োগের জন্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য--আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সেই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবারের এই সুমহান সংগ্রামে আমাদের সফল হতেই হবে। তা হলেই আমাদের সকল শহীদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির মূল মর্মবাণীই হচ্ছে আমাদের মাথা উঁচু করে সামনে চলা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে পথেই এগিয়ে চলেছি। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একুশে এবং একাত্তরের চেতনায় আমরা এগিয়ে যাব, এবার আমাদের শহীদদের স্বপ্ন সফল করতেই হবে।

সুধিমণ্ডলী,

ইতিহাস সব সময় সত্যেরই পক্ষে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর-কন্যা শেখ হাসিনার হাতেই ভিত্তি প্রস্থর স্থাপিত হয়েছিল এবং তারই উদ্যোগে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল, সেই মহান গৌরবের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিহিংসার কারণে যারা বন্ধ করে দিয়েছিল আজ জনগণের রায়ে তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজ জনগণের রায়ে মাননীয় শেখ হাসিনার হাতেই সেই কাজটি সম্পন্ন হল এবং তিনিই এর উদ্বোধন করলেন। এটাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম এবং শিক্ষা ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক একুশের চেতনার।

International Mother Language Institute

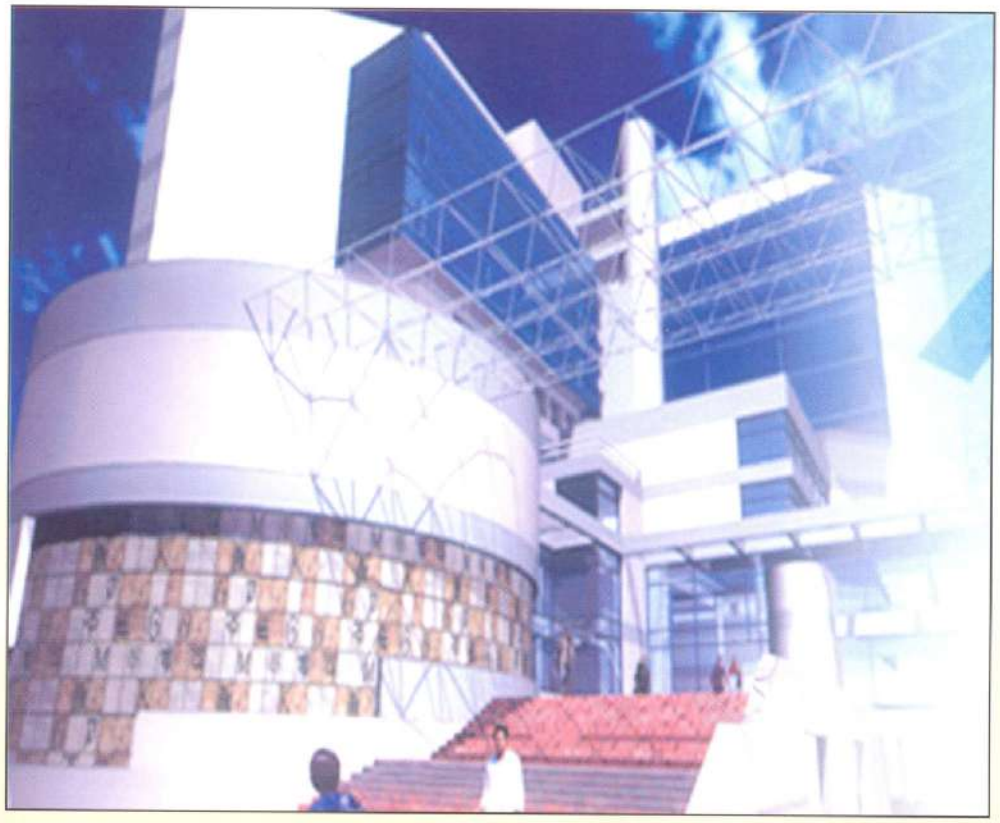

Ministry of Education, People's Republic of Bangladesh